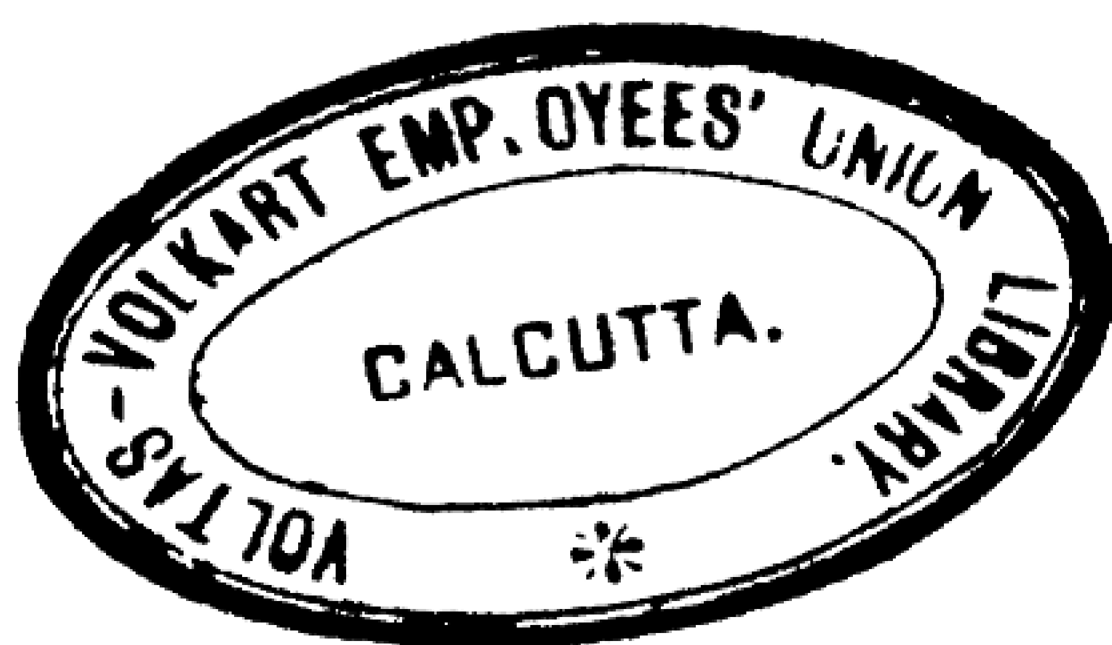
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭—অগ্রহায়ণ ১৩৬৩





আরোগ্য



মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

দ্বিতীয় প্রকাশ পৌষ ১৩৬৩

প্রকাশক

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

ক্যালকাটা বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড

৮৯, হ্যারিসন্ রোড কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর

শ্রীযুগলকিশোর রায়

সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২৭, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ

মণীন্দ্র মিত্র

ব্লক

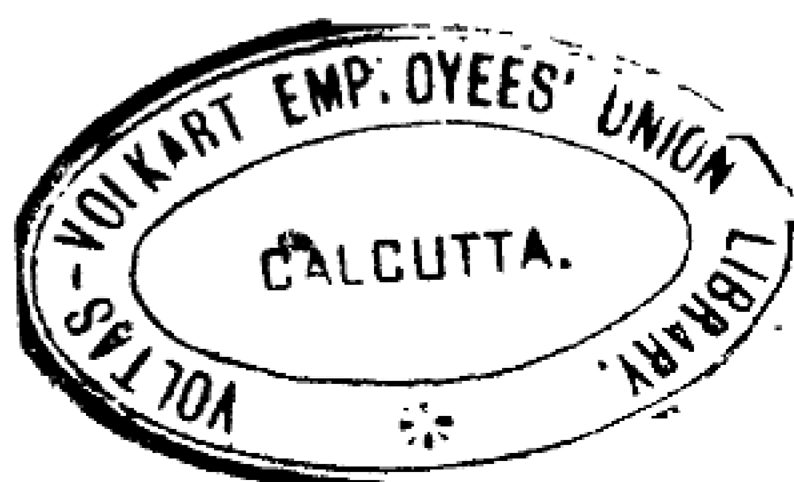
ব্লকম্যান

মুদ্রণ

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম তিন টাকা



মেয়েটি ফুটপাতের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল।

বেশ ভূষা থেকে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে টের পাওয়া যায় খাঁটি সহুরে মেয়ে। অর্থাৎ নতুন আমদানী নয়, সহরে বসবাস চলাফেরা তার ধাতস্থ হয়ে গেছে। যার সহজ একটা মানে এই যে খুব বেশীরকম অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেও সহরের রাজপথে চলার সময় তার অবচেতনা তাকে আপনা থেকেই কতগুলি সতর্কতা পালন করায়।

নীচু দরজাওলা বাড়ীর মানুষের যেমন কয়েকবার মাথায় ঠোক্কর খাবার পর ঠিক সময়ে মাথাটা নীচু করা স্বভাব দাঁড়িয়ে যায়, প্রত্যেকবার খেয়াল রাখার দরকার থাকে না।

অথচ বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটি করে কি, হঠাৎ কোনদিকে না তাকিয়ে রাস্তায় নেমে সোজা কয়েক পা এগিয়ে যায়। স্কুল কলেজ আফিস যাবার সময় রাজপথে দ্রুতগামী গাড়ীর যে দুমুখী স্রোতটা পাশাপাশি বয়ে চলে তারই কাছের স্রোতটার মধ্যে।

বিজ্ঞান অবশ্য নিখুঁত ভাবে জটিল ভাবে বলে দিতে পারে কেন এরকম ঘটে। নীচু দরজাটার কাছে হাজারবার আপনা থেকে মাথাটা নত হলেও কেন একদিন হঠাৎ অভ্যস্ত মাথাটা ঠোক্কর খেয়ে বসে, বছরের পর বছর দু'দিক তাকিয়ে ফুটপাত থেকে রাস্তায় নামাটা ধাত দাঁড়িয়ে গেলেও কেন সেই মানুষটাই একদিন হঠাৎ এভাবে চলন্ত গাড়ীর স্রোতের মধ্যে নেমে যায়।

কিন্তু কাহিনীটা বলছি কেশব ড্রাইভারের। মেয়েটির কাজের বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যা উহ্য থাক। মেয়েটিকে দ্বিতীয়বার আমাদের কাহিনীতে দেখা যাবে না।

মস্ত সেলুন গাড়ীটা সোজাসুজি মেয়েটিকে চাপা দিয়ে সাংঘাতিক রকম আহত করতে পারত, একেবারে মেরেও ফেলতে পারত। কারো কিছু বলার থাকত না। পিছনে গাড়ী, পাশে গাড়ী, ফুটপাতে মানুষের ভিড়। এ অবস্থায় আত্মহত্যা করার জন্য কেউ যদি এভাবে চলন্ত গাড়ীর ঠিক সামনে এসে দাঁড়ায়, প্রাণপণে ব্রেক কষেও গাড়ীটা থামাবার সময় বা ফাঁক না রাখে, তাকে চাপা দেবার অধিকার নিশ্চয় সে গাড়ীর চালকের আছে।

কিন্তু গাড়ীও কিনা মানুষ চালায় এবং জগতে এত সমারোহের সঙ্গে ছোট এবং বিরাট স্কেলে মানুষ মারা হয়ে থাকলেও মানুষকে বাঁচাতে চাওয়াটাই ধাত কিনা মানুষের, দুর্ঘটনাটা তাই হয়ে যায় একটু অন্যরকম।

দুর্ঘটনা ঠেকাবার উপায় ছিল না। সেলুন গাড়ীটার বেঁটে মোটা কালো রঙের ড্রাইভারটি গাড়ীর এবং নিজের খানিকটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মেয়েটিকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়।

দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণে ব্রেক কষার সঙ্গে সে গাড়ীটা ডাইনে ঘুরিয়ে দেয়। গাড়ীর ধাক্কায় মেয়েটি ছিটকে পড়ে ফুটপাতের দিকে, গাড়ীটা গিয়ে ধাক্কা মারে চলন্ত ট্রামটার গায়ে।

অদ্ভুত একটা টানা আর্তনাদের মত আওয়াজ ওঠে এক সঙ্গে অনেকগুলি গাড়ী ব্রেক কষার ফলে।

সেলুন গাড়ীটার পিছনে আসছিল পুরাণো লম্বাটে আকারের একটি গাড়ী। ব্রেক কষেও সেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেলুন গাড়ীটার উপরে।

ফলে পিছনের সিটের ডান দিকের কোণ ঘেঁষে যে প্রৌঢ় বয়সী ভদ্রলোকটি বসেছিল, চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পাশের সুন্দরী তরুণীটির কোলে ঢলে পড়ে—সিনেমার চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে আসল রসালো দৃশ্যটির মতই !

সব গাড়ী থেমে যায়। দেখতে দেখতে প্রকাণ্ড এক লোকারণ্য সেখানে জমাট বেঁধে ওঠে।

কি বিরাট ছন্দে কি রকম আশ্চর্য্য মসৃণ গতিতে সহরের এই একটি রাজপথে জীবনের স্রোত বয়ে চলেছিল, কি বিচিত্র ভাবে তাতে মেশানো ছিল নানা বিভেদ আর সামঞ্জস্য, ব্যাহত হয়ে থেমে যেতে সেটা যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগে ছিল নানা আওয়াজের মেশাল দেওয়া একটানা গুঞ্জন ধ্বনি, এখন তার চেয়ে জোরালো হয়ে ওঠে শুধু মুখর মানুষের মিলিত কলরব।

কত অল্প সময়ের মধ্যেই যে আবার ঠিক আগেকার অবস্থায় ফিরে যায় রাজপথটা।

দুর্ঘটনা গুরুতর নয়। একজনও মরেনি, হাসপাতালে পরে কারো মরবার সম্ভাবনাও নেই।

কয়েকজন আহত হয়েছে আর কমবেশি জখম হয়েছে খান চারেক গাড়ী।...বেশী চোট লেগেছে সেলুন গাড়ীটার ড্রাইভার আর যে মেয়েটি দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে তার—তবে তাদের আঘাতও তেমন মারাত্মক কিছু নয়। সেলুন গাড়ীটার পিছনের সিটের ভদ্রলোকের মাথার পিছন দিকটা দেখতে দেখতে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে, একখানা হাত গেছে মচকে।

এম্বুলেন্স এসে পড়ার আগেই পুলিশ ভিড়কে একপাশে ঠেলে দিয়ে রাস্তার ওপাশ দিয়ে গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা চালু করে দেয়।

এম্বুলেন্স এসে আহত মানুষ ক'জনকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। বেশী জখম সেলুন গাড়ীটার সামনের দিকটা শিকলে বেঁধে শূন্যে ঝুলিয়ে পিছনের দু'চাকায় গড়িয়ে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

তারপরেই দেখা যায় পথে যেমন চলছিল তেমনি চলেছে গাড়ী ও মানুষের দুমুখী ধারা। দাঁড়িয়ে থাকে কেবল সেলুনটার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল যে লম্বাটে বড় গাড়ীটা।

এই গাড়ীটা চালাচ্ছিল আমাদের কেশব।

কেশব ফুটপাতে নেমে গিয়েছিল আর গাড়ীতে ওঠেনি। তার নাকি মাথা ঘুরছে। ললনা নিজেই গাড়ীটা ধারে সরিয়ে এনে রেখেছে। তারপর কেটে গেছে কয়েক মিনিট। কেশব ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানে আর ঘন ঘন ঢোঁক গিলবার চেষ্টা করে।

ললনা বলে, আপনার কি হল কেশববাবু? দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

কেশব বলে, আমার এখনো মাথা ঘুরছে। চালাতে পারব না।

গীতা বলে, বাঃ বেশ! ওদিকে স্কুলে যে দেরী হয়ে যাবে আমার?

মাইনে করা ড্রাইভারেরও যে একটা মাথা আছে এবং বিশেষ অবস্থায় সে মাথাটা ঘুরতে পারে, এটা ললনা স্বীকার করে নেয়।

বলে, গাড়ীতে এসে বসুন, আমিই চালাচ্ছি।

মন্দ্রা হাত চেপে ধরে বলে, না ভাই! কাজ নেই!

আরও কয়েক মিনিট তারা সময় দেয় কেশবকে। ড্রাইভারেরও মাথা ঘোরা গা কেমন করার আছে বলেই শুধু নয়। কেশবের কাছে তারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল।

কেশব তাদের আশ্চর্য্যরকম বাঁচিয়ে দিয়েছে।

গাড়ীটা আরও বেশীরকম জখম হওয়া এবং তাদের বেশী আঘাত লাগা উচিত ছিল, বিশেষ করে কেশবের। কেশবের মত পাকা

ড্রাইভার না হলে এত অল্পের উপর দিয়ে রেহাই পাওয়ার আশা সত্যিই কম ছিল।

কে জানে কি ভাবে মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল কেশব! এতক্ষণ এই কথাই তারা বলাবলি করছিল নিজেদের মধ্যে। সামনের গাড়ীটার সঙ্গে ধাক্কা লাগবেই জেনে সেটা এড়াবার চেষ্টায় সে দিশেহারা হয়ে বিপদ ঘটায় নি। পাশ কাটাবার চেষ্টা করলেই সেলুনটার উপরে গিয়ে পড়তে হত কোণাকুনি ভাবে। ফলটা হত ঢের বেশী খারাপ। তাই, পাশ কাটাবার বদলে আরও সোজাসুজি সেলুন গাড়ীর উপরে গিয়ে পড়বার জন্যেই সে উল্টো দিকে চাকা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে।

ঃ এত সব ভাবলেন কখন?

কেশবের মুখে ছিল একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব। চাউনিটা যেন ভোঁতা হয়ে গেছে।

ঢোঁক গিলে সে বলেছিল, ভাবিনি তো। মনে হল এরকম করলে—

কথাটা সে শেষ করেনি।

ঝাঁকি তাদের লেগেছে, বাইরেও লেগেছে ভেতরেও লেগেছে। একটু সময়ও লেগেছে সামলে উঠতে।

কিন্তু পাকা ড্রাইভার কেশবের হল কি? এমনি তার মাথা ঘুরছে যে গাড়ীই চালাতে পারবে না! আবার একটা সিগারেট ধরাল যে!

ললনার গাড়ীতে চেপে গীতা স্কুলে পড়াতে যায়। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায় সে এবার প্রায় মালিকের মতই ধমক দিয়ে কেশবকে বলে, ছেলেমানুষি করবেন না। চোট লাগেনি কিছু না, গাড়ী চালাতে পারবেন না কেন?

কেশব গলাটা সাফ করে বলে, কি রকম যেন লাগছে আমার।

গীতা জোর দিয়ে হুকুমের সুরে বলে, গাড়ীতে ষ্টার্ট দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে। জোরে চালাবেন, আমার দেরী হয়ে গেছে।

তবু কেশব ইতস্ততঃ করে।

শোভনা মিনতি করে তাকে বলে, আপনিই চালান কেশববাবু। ললনা শেষকালে সত্যি সত্যি এ্যাকসিডেণ্ট ঘটিয়ে আমাদের মারবে!

ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে কেশব নিজের যায়গায় বসে গাড়ীতে ষ্টার্ট দেয়। গাড়ীটা একটু আস্তেই চলে প্রথমে। খানকয়েক গাড়ী পিছন থেকে হর্ণ বাজিয়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলে যায়।

তারপর আপনা থেকেই যেন স্পীড বেড়ে যায়। একটা ফাঁক পেয়ে কেশব দু'খানা বাস আর চারখানা প্রাইভেট গাড়ীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায়।

শোভনা বলে, মাথা ঘুরছে বলছিলেন, একটু আস্তে চালান না?

কেশব নিশ্চিন্তভাবে বলে, না, ঠিক হয়ে গেছে।

কে জানে কি রকম মাথা ঘোরা গা কেমন করা তার, গাড়ী চালাবার আগে পর্য্যন্ত কাবু করে রাখে, গাড়ী চালাতে সুরু করলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

গীতার চাকরীর দায়, প্রাণের ভয়ের চেয়ে যে দায় বড়। সে বলে, যত জোরেই চালান, আজ লেট হয়ে গেলাম।

স্কুলের কাছাকাছি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ী থামতেই গীতা তাড়াতাড়ি নেমে যায়।

বাড়ী থেকে গাড়ীতে ললনা রওনা দেয় একা, পথে একে একে তিন জনকে তুলে নেয়।

মন্দ্রা ও শোভনা ললনার ক্লাশ ফ্রেণ্ড। গীতা তাদের চেয়ে সাত আট বছর বয়সে বড় হবে। মন্দ্রাকে তুলে নিতে খানিক ঘুরে তারা

বাড়ীর দরজায় গাড়ী নিয়ে যেতে হয়। মেয়েটা এমনিতে খুব নিরীহ সাদাসিদে আর সরল কিন্তু ভয়ানক অভিমানিনী।

গীতা আর শোভনা সময়মত বাড়ী থেকে একটু হেঁটে এসে বড় রাস্তায় ফুটপাতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গাড়ীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে।

স্কুলের সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী পয়েণ্টে গীতাকে নামিয়ে দিয়ে তারা চলে যায়।

সপ্তাহে দু'দিন গীতাকে স্কুলে যেতে এবং অন্য দু'দিন স্কুল থেকে ফিরতে বাসের পয়সা খরচ করতে হয়। দু'দিন এদের ক্লাশ থাকে এত দেরীতে এবং অন্য দু'দিন ক্লাশ শেষ হয় স্কুল ছুটি হবার এত আগে যে গীতাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে যাওয়া অথবা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না।

বাধ্য বাধকতা কিছুই নেই, একটা আস্ত গাড়ীতে একলা কলেজ যাতায়াত করতে ললনার ভাল লাগে না বলে সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে ব্যবস্থাটা চালু করেছে।

নিছক খেয়াল বা সখ নয়, বিচার বিবেচনাও আছে এ ব্যবস্থার পিছনে।

গীতা ও শোভনার দুবেলা যাতায়াতের খরচ বেঁচে যাওয়াটা গণনীয় ব্যাপার। কিন্তু মন্দ্রার বেলা সে প্রশ্নই আসে না—যদিও তার বাবার মোটর গাড়ী নেই।

ট্রাম বাসে যাতায়াতের কষ্ট বাঁচানোটাই হয়েছে তাদের হিসাবে সব চেয়ে বড় কথা। ওই দুর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই তারা বিশেষভাবে ললনার কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করে।

কতটুকু সময়ের জন্যই বা তারা গড়ীতে একত্র হয়! সেইটুকু সময়ের মধ্যেই তাদের কথাবার্ত্তা তর্কবিতর্কের ভিতর থেকে নতুন দিনের মেয়েলি

মনের এলোমেলো টুকরো টুকরো পরিচয় বেরিয়ে আসে। কেশব আশ্চর্য্য হয়ে বিব্রত হয়ে শোনে।

কত বিষয়ে কি স্পিডেই যে ওরা কথা চালায়! গোড়ায় কেশব বেশীর ভাগ কথা বুঝতেই পারত না, মনে হত ঠিক যেন পাখীর কিচির মিচির। শুধু শুনতে শুনতেই ভাষাটা তার আয়ত্ত হয় নি। ললনার যে সব কাগজ আর মাসিক পড়ে, অবসর কাটাতে সেগুলি পড়েও ওদের ভাষা বুঝতে তার অনেক সাহায্য হয়েছে।

অন্ততঃ তার গাড়ীটা সম্পর্কে এরা সময়-নিষ্ঠা অর্জ্জন করেছে অদ্ভুত রকম। গাড়ী নিয়ে সে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আগে পৌঁচেছে এটা ঘটে কদাচিৎ! যখন ঘটে তখনও গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখে বিরক্ত হয়ে উঠবার সুযোগ পাওয়া যায় না। অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্রুত পদে গাড়ীর দিকে হেঁটে আসতে দেখা যায় গীতা বা শোভনাকে।

মন্দ্রাও ঘড়ি ধরে তৈরী হয়ে অপেক্ষা করে। বাড়ীর দরজায় গাড়ী দাঁড়াতে না দাঁড়াতে প্রতিদিন তাকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

একদিনও তাকে ভেতর থেকে বলে পাঠাতে হয় নি যে একটু দাঁড়াও, বেরিয়ে এসে বিব্রত ভাবে কৈফিয়ৎ দিতে হয় নি কেন দেরী হল।

কেশব ভাবত, বিনা পয়সায় গাড়ী চড়বার লোভে গীতা আর শোভনা নিশ্চয় অনেকক্ষণ আগে থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

কয়েকবার সে দু'জনকে ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করেছে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন?

গীতা হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে এবং শোভনা না তাকিয়ে প্রায় একই রকম জবাব দিয়েছে: না এই মাত্র এসেছি, দু'এক মিনিট।

শোভনার হাতে ঘড়ি বাঁধা নেই এটা কেশব লক্ষ্য করেছে।

ললনাদের কলেজে নামিয়ে নিয়ে আরেকটা দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করে কেশব।

সামান্য দুর্ঘটনা। বাস থেকে যাত্রী নামতে নামতে বাস ছেড়ে দেয়, একজন বুড়ো মানুষ নামতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। ব্যথা পায়, এখানে ওখানে ছড়ে গিয়ে সামান্য রক্তপাতও ঘটে। তার বেশী কিছু নয়।

বুড়ো কিন্তু এমন আর্ত্তনাদ করে আর রাস্তার লোক ধরে তুললে বাসের ড্রাইভারকে এমনভাবে গলা ফাটিয়ে গালাগালি দিতে থাকে যে সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে যায়।

বাসটাকেও দাঁড়াতে হয়।

পথের মানুষরাই দাঁড় করিয়ে দেয়। চালককে টেনে নামিয়ে আনে।

দোষটা কিন্তু বুড়োর নিজের। তাকে দেখে আর তার চেঁচামেচি শুনেই টের পাওয়া যায় যে গাঁয়ের লোক। বাস থেকে নামতে জানলে আছাড় খাওয়ার কোন কারণ ছিল না।

চেঁচামেচি করে ওঠায় চালককে মারতে উদ্যত ক্রুদ্ধ জনতাকে উদ্দেশ্য করে বাসের কণ্ডাক্টার চীৎকার করে সে কথা জানায়।

কিন্তু একা তার চেষ্টায় ড্রাইভার রেহাই পেত না! বাসের কয়েক জন যাত্রীও তাকে সমর্থন করে জনতার বেপরোয়া উত্তম মধ্যমের হাত থেকে এ যাত্রা ড্রাইভার বেঁচে যায়।

বাস চলে যায়। বুড়োও গজর গজর করতে করতে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে সুরু করে। ভিড় ছড়িয়ে যায়।

কিন্তু দেহটা আবার অবশ মনে হয় কেশবের। চাবি টিপে গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার শক্তিও সে যেন খুঁজে পায় না।

অন্ধ যুক্তিহীন জনতা! সেলুন গাড়ীর সেই প্রৌঢ় লোকটির আঘাতে গুরুতর হলে কিম্বা একেবারে মরে গেলে তাকেও তো আজ ক্রোধে উন্মাদ

মানুষেরা এমনিভাবে টেনে নামিয়ে মারতে মারতে মেরে ফেলতে পারত !

কপালের কথা কে বলতে পারে? কোন অশুভক্ষণে কবে সে মানুষ মেরে বসবে, নিজেও মারা পড়বে। কী মারাত্মক রকম বিপজ্জনক তার কাজ !

সাধে কি মা বারণ করেছিলো এ কাজ নিতে, মায়া কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আজও মায়া কি সাধে প্রতিদিন দারুণ উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে তার জন্য রাস্তায় চোখ পেতে রাখে, তাকে ফিরতে দেখলে যেন জীবন ফিরে পায়।

গাড়ী নিয়ে এখানে দাঁড়াবার হুকুম নেই। ট্র্যাফিক পুলিশ এসে ধমক দিয়ে যায়। চোখ কান বুজে কেশব গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে সাবধানে আস্তে আস্তে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু শত শত গাড়ী যখন একই দিকে বেগে চলেছে তখন এতখানি কম স্পিডে গাড়ী চালানোর অসুবিধাও অনেক। খানিক এগিয়ে যেতে যেতেই পিছনে অসহিষ্ণু হর্ণের আওয়াজ শুনতে শুনতে আপনা থেকেই গাড়ীর স্পিড সে বাড়িয়ে দেয়।

ষ্টার্ট দিলেই মৃত গাড়ীটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। চালাতে সুরু করলেই যেন সে জীবনে গতি পায়। সেই গতিতেই যেন লয় পায় কেশবের দেহ মনের নিদারুণ অশান্তি।

কিন্তু গাড়ী গ্যারেজে ঢুকিয়ে গ্যারেজের লাগাও নিজের ছোট কুঠরিতে গিয়ে জামা ছাড়তে ছাড়তে আবার এক অকথ্য গভীর বিষাদে মন ভরে যায়।

সে বিষাদের আবার ঝাঁজ আছে। প্রাণটা জ্বালা করে !

অজানা দুর্বোধ্য নালিশ উথলে উঠতে চায় বুকের কড়ায়ে।

কি অপরাধ সে করেছে যে যে কাজে তার সবচেয়ে বেশী বিতৃষ্ণা সেই কাজটাই তাকে করতে হবে জীবিকার জন্য ?

নিমাই বলে, বিড়ি হবে একটা ?

নিমাই বাড়ীর ছোকরা চাকর এবং গাড়ীটার ক্লিনার। বাড়ীর লোকের ফুটফরমাস খাটে, গ্যারেজ ঝাঁট দেয়, গাড়ীর চাকা ধোয় আর বডি মুছে সাফ করে।

কোন দিন ভালভাবে করে। কোনদিন যেমন তেমন ভাবে করে। কোনদিন একেবারে ফাঁকি দেয়।

সাধারণতঃ হাফ প্যাণ্ট পরে থাকে। কিন্তু তার জন্য এক সেট পায়জামা আর হাওয়াই জামার ব্যবস্থাও করা আছে। ছুটির দিন আর অন্যান্য দিন সন্ধ্যাব পর বাড়ীতে অতিথি সমাগম ঘটলে নিমাই হাফ প্যাণ্ট ছেড়ে পায়জামা আর হাওয়াই জামা পরে সকলকে চা সিগারেট জোগায় ফুটফরমাস খাটে।

একনম্বর ফাজিল আর বখাটে ছেলে। কিন্তু ডাগর ডাগর চোখওলা গোলগাল মুখখানায় এমন একটা ভীরু সচকিত মেয়েলি বেদনার ভাব আছে যে তাকে দেখলেই যেন মায়া হয়।

ফাঁকিবাজ ছোঁড়াটার জন্য গাড়ীর ক্লিনারের কাজ কেশবকেই করতে হয় বেশীর ভাগ। কতবার সে নালিশ করার কথা ভেবেছে স্বয়ং কর্তার কাছে, ছোঁড়ার ওই মায়াবী মুখটার জন্য আজ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি নালিশটা পেশ করতে।

বিড়ি চাওয়ার জবাবে কেশব শুধু একনজর তাকায় তার দিকে। ললনার কাছে ধার করা বইটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে।

সহজে ভড়কে যাওয়ার ছেলে নিমাই নয়। মিনতি আর নালিশ মেশানো সুরে সে বলে, বিড়ি সিগ্রেট টানি জানই তো

দাদা, একটা দিলে দোষ কি? তুমি না দিলে শম্ভুর কাছে চাইব তো!

: দোষ কি চাইলে?

: ও বড় ছ্যাঁচরা।

শম্ভু রান্নার কাজ করে। দরকারের সময় খানসামা সেজেও কাজ চালিয়ে দেয়। চালাক চতুর চটপটে মানুষ, চাউনি দেখেই টের পাওয়া যায় মগজটা তার প্যাঁচালো বুদ্ধিতে ঠাসা।

কি যে সে প্যাঁচালো বুদ্ধি সেটাই কেবল ধরা যায় না। কেশব তো এসেছে সেদিন, শম্ভু পুরানো বিশ্বাসী লোক চার বছরের উপর আছে। প্যাঁচালো কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় মেলে এমন কিছুই সে আজ পর্য্যন্ত করেনি।

কেশব তাকে পছন্দ করে না। শম্ভুর মুচকি মুচকি হাসি দেখলে তার গা জ্বালা করে।

একটা সিগারেট দিতেই নিমাইয়ের গোমরা মুখে হাসি ফোটে। ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে টান দেয় পাকা ধোঁয়া-খোরের মত।

: বিড়ি সিগ্রেট খেয়েই তুই মরবি। মা বাপ নেই?

বাপ মা ভাই বোন সব আছে নিমাই-এর, দেশে আছে। ললনাদের দু'পুরুষ আগে ছেড়ে আসা দেশে। ললনার ঠাকুর্দ্দার বাবার গোমস্তা ছিল নিমাই-এর ঠাকুর্দ্দার বাবা!

নিমাই যেন বলতে চায় যে সে কি নিছক মাইনে করা চাকর অনিমেষের বাড়ীতে? তা যেন ভাবে না কেশব। এদের সঙ্গে তার কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক!

: ললনাদি আমায় কত ভালবাসে জানো? শম্ভুকে হুকুম দিয়েছে

খিদে পেলে খুসীমত নিয়ে খাব, কিছু বলতে পাবে না। ঠাণ্ডা লাগবে বলে খোলা ছাতে শুতে দেয় না। বলে কি জানো? শভু অর্জুনেরা শুক, তোর সইবে না। গরম লাগে তো ঘরে ফ্যান চলে, মেঝেতে শুয়ে থাকবি।

ঘাড় উঁচু করে তাকায় নিমাই। তার অহঙ্কার যেন কেশবকে চ্যালেঞ্জ করা, আমার সঙ্গে পারবে তুমি?

কেশব মোলায়েম কণ্ঠে বলে, বোস নিমাই। নিমাইকে পাশে বসিয়ে তার গায়ে হাত রেখে আরও মৃদু আরও স্নেহভরা স্বরে জিজ্ঞাসা করে, বাড়ীর জন্য মন কেমন করে না রে?

নিমাই শুধু মুখ বাঁকায়।

: মার জন্য বেশী মন কেমন করে, না?

: না, ছোট বোনটার জন্য।

মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে নিমাই। তার বড় বড় চোখ দুটি ধীরে ধীরে জলে ভরে ওঠে। টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে।

: ছুটি নিয়ে গেলেই পারিস দেশে?

: গিয়ে খাব কি? ওরাই না খেয়ে মরছে।

কেশব একটু কড়া স্বরে বলে, সিগারেট খাস যে?

: কিনে তো খাই না।

নিমায়ের পরণে হাফ প্যাণ্ট। নিজের কাপড় দিয়েই কেশব তার চোখ মুছিয়ে দেয়।

শভুর গলা শোনা যায়: ও ডেরাইভার বাবু, হুজুর আজ খাবেন দাবেন না? ছুটি মিলবেনা গরীবের?

খেয়ে উঠে খবরের কাগজটা চেয়ে এনে কেশব শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ে

হেড লাইন গুলিতে চোখ বুলোতে বুলোতে আজ গভীর ঘুম নেমে আসে কেশবের চোখে। বেলা চারটের সময় ললনাকে আনতে যেতে হবে। তার আগে কোন ডিউটি নেই। অবশ্য বাড়ীর মেয়েদের যদি হঠাৎ কোন খেয়াল না চাপে বা কোন প্রয়োজন উপস্থিত না হয়।

এলার্ম ঘড়িটা ঠিক করে মাথার কাছে রেখে সে শোয়। তিনটের সময় এলার্ম বাজবে। চারটে পর্য্যন্ত-দূরে থাক তিনটে পর্য্যন্তও সে ঘুমোতে পারবে না জানে, অনেক আগে জেগেই পরে এলার্ম শুনবে তবু কেশব এলার্ম ঠিক না করে শুতে পারে না।

যদি না ঘুম ভাঙ্গে আজ ? কোনদিন ঘুম আসে কোনদিন আসে না। ঘুম এলেও ঘণ্টা খানেকের বেশী কোনদিন ঘুমোতে পারে না, তবু যদি সময় মত না ভাঙ্গে ?

আজ সত্যই তার ঘুম ভাঙ্গল কানের কাছে ঘড়ির বাজনার আওয়াজে। এলার্ম না বাজলে হয়তো আরও ঘণ্টা খানেক ঘুমের জের চলত।

কত কাল তার এমন গাঢ় ঘুম হয় নি ?

ঘড়ির বাজনা থামিয়ে দিতে দিতেই কিন্তু বুকটা তার ধড়াস করে ওঠে।

অর্গান বাজিয়ে ললনা গান করছে !

কি ব্যাপার ? ঘড়ি ঠিক আছে, বাইরে রোদের দিকে তাকালেও বোঝা যায় তিনটের বেশী বেলা হয় নি। কোন কারণে আগেই কি কলেজে ছুটি হয়ে গেছে ললনার ? ট্রামে বাসে কিম্বা ট্যাক্সিতে সে বাড়ী ফিরেছে ?

ললনর গানটা শুনতে শুনতে একটা চমক লাগে কেশবের। এই অসময়ে ললনা তো গান করে না।

এটা সাধারণতঃ ঘটে থাকে শনিবার। সন্ধ্যার পর প্রায় শনিবারেই অনেক লোকজন আসে, বিশেষ বৈঠক বসে। সে আসরে ললনাকে গান গাইতে হয়—নতুন গান। আগে থেকে সে গানটা ঠিক করে রাখে।

খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে কেশব থ বসে থাকে খানিকক্ষণ। একেবারে বারের ভুল হয়ে গেছে তার? আজ শনিবার, হু'টোর সময় তার গাড়ী নিয়ে কলেজে হাজির হওয়ার কথা।

তার জন্যে অপেক্ষা করে করে বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হয়ে ট্রামে বাসে বা ট্যাক্সিতেই ললনা বাড়ী ফিরেছে নিশ্চয়।

হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে কেশব তাড়াতাড়ি জামা গায়ে দিতে যায়। চারিদিকে ঝাপসা হয়ে আসায় চোখ বুজে বসে থাকতে হয় খানিকক্ষণ। গলা শুকিয়ে গেছে। হাত পা কাঁপছে।

তা হোক, এখনো সময় আছে। ললনার বেলা ভুল হয়ে গিয়ে থাক, অনিমেষের আপিসে ঠিক সময়েই গাড়ী নিয়ে যেতে পারবে।

একটু বিশ্রাম করে কুঁজো থেকে একগ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে সে গ্যারেজে যায়।

দেখতে পায় অনিমেষ স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছে গ্যারেজে। ও বেলায় অ্যাকসিডেণ্টে গাড়ীটা কিরকম জখম হয়েছে পরীক্ষা করছে।

বিরক্ত হওয়ার বদলে বেশ খুশীই মনে হয় তাকে।

: এই যে কেশব। ঘুমোচ্ছিলে বুঝি? আমি আজ আগেই চলে এলাম। ললনা টেলিফোনে অ্যাকসিডেণ্টের খবরটা জানাতেই ট্যাক্সি করে চলে এসেছি।

কেশব বলে, কি করে যে ভুল হয়ে গেল আজ শনিবার। কলেজে গাড়ী নিয়ে যাওয়া হল না—

: ভালই হয়েছে। আজ আর গাড়ী বার কোরো না। কাল আসবার সময় একেবারে কানুকে সঙ্গে নিয়ে আসবে, ভাল করে দেখবে কোন ড্যামেজ হয়েছে না কি। বিশেষ কিছু হয় নি, না?

: মনে তো হয় না।

: তবু একবার দেখা ভাল। হয় তো সামান্য খুঁত হয়েছে, অল্পে সারানো যাবে। নইলে গাড়া চালাতে চালাতে বেড়ে গিয়ে একদিন হঠাৎ একেবারে বিগড়ে যাবে গাড়ীটা।

অনিমেষ স্মিত মুখে তাকায় কেশবের দিকে।

: তুমি নাকি শুনলাম খুব কায়দা করে মেয়েটাকে আর গাড়ীটাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ? নিজে সিরিয়াসলি উণ্ডেড হবার রিস্ক নিয়েছিলে?

কেশব চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ঢোঁক গিলবার চেষ্টা করে।

: ললনা গাড়ীগুলির পজিসন এঁকে আমায় এতক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করছিল। একটু এদিক ওদিক হলেই গাড়ীটা তো বেশীরকম জখম হতই, তোমার বিপদ হত বেশী, ললনারা বেঁচে যেত। আমারও তাই মনে হল। ও সময় মাথা ঠিক রাখা তো সহজ কথা নয়!

বেশ বোঝা যায় অনিমেষ অত্যন্ত খুসী হয়েছে। সহজে গদ গদ হবার মানুষ সে মোটেই নয়।

কিন্তু প্রশংসা শুনে কেশব সুখী হয়েছে মনে হয় না। তার কাঁচুমাচু বিনীত ভাবটা শুধু কেটে যায়।

সে ভাবে, এত পিঠ না চাপড়ে দশটা টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেই হয়!

মুখে বলে অন্য কথা।

: আমায় যদি আজ দরকার না থাকে—

: না, আর দরকার কি? তুমি বাড়ী যেতে পার।

একটু হেসে অনিমেষ বলে, তোমার ঘর টানটা কিন্তু বড়ই খাপছাড়া কেশব। একজন ইয়ং ম্যান, নিজের ফ্যামিলি নেই, ছুটি পেলেই বাড়ী ছোট—এর মানেই বুঝতে পারিনা আমি।

কেশব চুপ করে থাকে।

অনিমেষ তখন গম্ভীর হয়ে বলে, বাইরের বদ খেয়ালের চেয়ে এটা অবশ্য ভাল।

দুই

সারাদিন ডিউটি দিয়ে সত্যই কেশব প্রায় রোজ রাত্রেই গ্রাম্য সহরতলীতে তার পুরানো ভাঙাচোরা নোংরা বাড়ীতে ফিরে যায়।

সহরের সৌখীন এলাকায় অনিমেষের আধুনিক ফ্যাশনের নূতন রঙ করা বড় বাড়ী। গ্যারেজের লাগাও ড্রাইভারের থাকবার ঘরটি ছোট হলেও খোলামেলা ঝকঝকে তকতকে। প্রতি বছর বাড়ীটির আগাগোড়া চুণ ফেরানো রঙ লাগানো হয়, এ ঘরটিও বাদ যায় না।

ষ্টেশন পেরিয়ে সেই কতদূর বোসপাড়া, সেখানে ইঁট বার করা নোনায় ধরা দালানের ছোট ছোট ঘর, আলকাতরা মাখানো ছোট ছোট জানালা দিয়ে ভাল আলো-বাতাস খেলে না ঘরের মধ্যে, ভিতরটাও ভাঙাচোরা জিনিষপত্রে বোঝাই।

রাত্রিটুকুর জন্য অত দূরে ওরকম একটা ঘরে রাত কাটাতে যাওয়ার বদলে এখানে থাকলে রাত্রের খাওয়াটাও কেশব পায়।

বাড়ীর সেই একঘেয়ে শাক-চচ্চড়ি কুচো চিংড়ির বদলে বড়লোকের বাড়ীর আধুনিক রুচির পুষ্টিকর সুখাদ্য। কিন্তু দেখা যায় সুখাদ্যের চেয়ে বাড়ীর টানটাই কেশবের ঢের বেশী জোরালো।

রাত বেশী না হলে ষ্টেশন পর্য্যন্ত ট্রাম বাস পাওয়া যায়। কিন্তু ষ্টেশনের পাশ দিয়ে লেভেল-ক্রসিং পেরিয়ে গেলে আর ওসব বালাই নেই।

বোস পাড়া পর্য্যন্ত প্রায় একমাইল রাস্তা তাকে হাঁটতে হয়। সেখানে ছোট বড় নতুন পাকা বাড়ী আছে, বৈদ্যুতিক আলো আছে, সাজানো মনোহারী দোকান এবং লণ্ড্রী হেয়ার কাটিং সেলুন এসবও আছে, কিন্তু আছে অপ্রধান হয়ে। প্রাধান্য সেখানে জরাজীর্ণ কাঁচা-পাকা বাড়ীর, গেঁয়ো বাঁশঝাড় ডোবাপুকুরের সঙ্গে মেশানো সহুরে বস্তি খাটাল আর কাঁচা নর্দ্দমার।

বাগানবাড়ী আছে দু'চারটা। কিছু লোকের ছোটোখাটো বাসভবনের লাগাও একরত্তি বাগানেও ফুল কিছু কিছু ফোটে। কিন্তু ফুলের গন্ধ হটিয়ে দুর্গন্ধই জাহির করে রাখে নিজেকে।

তাছাড়া আছে মশা আর মাছি। দুয়েরই অখণ্ড প্রতাপ।

তবু কেশবের ফিরে যাওয়া চাই। বিশেষ কারণে রাত বেশী হয়ে গেলে ট্রাম বাস মেলে না, কেশব হেঁটেই রওনা দেয়। সরকারদের বাড়ী থেকে ষ্টেশনও প্রায় আধ মাইল রাস্তা।

ফিরে আসতে হয় খুব ভোরে। অনিমেষের তিয়াত্তর বছরের বুড়ী মাকে রোজ সকালে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যেতে হয়।

কেশব বিয়েও করেনি।

অর্থাৎ আলোয় ঝলমল এমন খোলামোলা পরিচ্ছন্ন এলাকায় সুন্দর বাড়ীতে এমন সুবিধাজনক একটি ঘর থাকতে, নিজের বাড়ীতে আপনজনের মধ্যে শুধু কয়েক ঘণ্টা ঘুমানোর জন্য তার ফিরে যাওয়া!

বাড়ীতে সেকেলে গেঁয়ো স্বভাবের একগাদা আপনজন। মা বোন মাসী পিসী ভাই ভাজদের সে সংসারে প্রায় পরের মত হয়ে গেলও যারা আজও তার আপন জন হয়ে আছে।

ললনা বিশ্বাস করে না।

তার বাড়ীর সমস্ত খবর সে জেরা করে জেনে নিয়েছে। ওই

বাড়ী আর ওই আপন জনদের জন্য তার এত টান? এ একেবারে অসম্ভব কথা! মাঝে মাঝে গেলে অবশ্য আলাদা কথা ছিল।

আজও এ্যাকসিডেন্টের দৌলতে সকাল সকাল ছুটি পেয়ে কেশব বাড়ীর দিকে ছুটেছে শুনে সে হেসে বলে, বাড়ীই যে যায় তোমরা জানলে কি করে? সঙ্গে গিয়েছো কোনদিন?

মেয়ের কথার গতি অনুমান করে তার মা নির্ম্মলা। ভুরু কুঁচকে বলে, কি বলছিস তুই!

ঃ বলছি, বাড়ী যায় না ছাতি! কোথায় আড্ডা আছে নয় ইয়ে টিয়ে আছে—

ঃ চুপ কর ললনা!

ধমক নয়। সে সাহস নির্ম্মলার নেই। এতবড় স্বাধীনচেতা মেয়ে! বিরক্তি আর বেদনার সঙ্গে শুধু প্রতিবাদ জানালো যে পাঁচজনের সামনে কোন মেয়ের মুখে একটা পুরুষের রাত করে ইয়ে টিয়ের কাছে যাওয়ার কথা বলা শোভা পায় না।

মার ক্ষোভ ললনা টের পায়। কিন্তু ভেবে পায় না তার শিক্ষিতা একেলে মায়ের এটা কিসের সংস্কার, কোথা থেকে এল!

সংসারের সাধারণ একটা বাস্তব কার্য্যকারণ নিয়ে ইঙ্গিত করাটা কেন মার কাছে দোষনীয় ঠেকে কে জানে!

বাড়ীই ফিরে যাচ্ছিল কেশব। কিন্তু বেলায় রওনা দিয়েও বোস-পাড়া পৌছতে তার সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল।

হরেনের মোটর মেরামতীর গ্যারেজের হেড মিস্ত্রী কানুকে বলে যেতে হবে, ভোরে তার সঙ্গে গিয়ে অনিমেষের গাড়ীটি পরীক্ষা করে দেখবে যে দুর্ঘটনায় রোগ-ব্যারাম কিছু হয়েছে নাকি।

অনিমেষ তো তাকে বলেই খালাস। তার বিশেষ বন্ধু হলেও

চারিদিকে কানু মিস্ত্রীকে নিয়ে কি রকম টানাটানি, আগে থেকে বলে না রাখলে সেও যে কানু মিস্ত্রীর পাত্তা পাবে না, এখবর তো আর ভদ্রলোক রাখে না।

ওয়ার্কশপের মধ্যে একটা শূন্যে তোলা গাড়ীর তলায় আধশোয়ার মত বাঁকা হয়ে বসে কানু গাড়ীটার হৃদপিণ্ডে কি একটা চিকিৎসা চালাচ্ছিল। নিশ্চয় কঠিন আর গুরুতর চিকিৎসা।

কেশব ডাকে, কানু ?

কানু বলে, দাঁড়া।

বলে প্রায় আধঘণ্টা নিঃশব্দে একমনে ইঞ্জিনটার চিকিৎসা চালিয়ে যেন চটেমটেই বেরিয়ে আসে।

গায়ের তেলকালি মাখা কভারটা খুলে ফেলতে ফেলতে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, ব্যাটারা যত সব ধ্যাধ্যেরে পচা মরা গাড়ী এনে দেবে— আর আমায় হুকুম করবে কানু সারিয়ে দাও।

: কেন, গাড়ীটা তো নতুন লাগছে ?

: গাড়ী তো নতুন, ইঞ্জিনটা ঠাকুর্দ্দার চেয়ে বুড়ো। ঠাকুর্দ্দার হাড়ের চেয়ে রদ্দি মাল দিয়ে ইঞ্জিনটা করেছে। শুধু বাইরেটা দেখে এ গাড়ীটা কেউ কেনে ?

ওয়ার্কশপের মালিক হরেনের পরণে মিলিটারীর পরিত্যক্ত ফুল প্যাণ্ট আর সার্টে সিভিলিয়ানী সামঞ্জস্য করা বেশ। মুখের চামড়া যেন শুকনো আমসির ছাল দিয়ে গড়া।

: কাল কিন্তু গাড়ীটা ছাড়তেই হবে কানু। রসিকবাবুর ভাগ্নের গাড়ী। রসিকবাবুর ঝাকাই কিন্তু গাড়ীটারীর ব্যাপারে কর্ত্তা।

কানু বলে, গাড়ীটার শ্রাদ্ধ করতে বলে দিন।

হরেন চটে বলে, কি রকম ?

কান্নু বিড়ি ধরিয়ে বলে, চটছেন কেন? মানুষ মরে গেলে ডাক্তার বাঁচাতে পারে? মরা একটা ইঞ্জিন পাঠিয়ে আপনাকে বলছে বাঁচিয়ে দাও। মরা ইঞ্জিন বাঁচাতে শিখিনি বাবু। আমার দ্বারা হবে না। ইঞ্জিনিয়ার বাবু যদি বলেন কিছু করা যায়, আমাকে যা করতে বলেন করব। মুখ্যসুখ্য মিস্ত্রি বাবু আমি, ভাঙা পচা ইঞ্জিন সারাবার বিদ্যে পাব কোথা?

হরেন বলে, সেরেছে! শেষে আমার ঘাড়েই চাপালো?

কান্নু মৃদুস্বরে বলে, কাল হপ্তা পাইনি, আজ আমার চাই। পাঁচ রোজ ওভারটাইম আছে।

হরেন কয়েক মুহূর্ত্ত পাথরের মূর্ত্তির মত অপলক চোখে চেয়ে থাকে। তারপর খেদ আর অনুযোগের সুরে বলে, আমার সঙ্গে এরকম কারস কেন'রে? আমার অবস্থাটা বুঝবি না তুই?

কান্নু শেষ টানে বিড়িটার সুতো পর্য্যন্ত পুড়িয়ে উদাস উদার ভাবে বলে, বুঝতে দেন না, তাই বুঝি না। যাক গে বাবু, হপ্তাটা দিয়ে দিন।

কেশব লক্ষ্য করে, ওয়ার্কশপের একত্রিশজন কারিগর খানিক তফাতে এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। একেবারেই যেন স্বার্থ বলতে তাদের কিছুই নেই। সারা সপ্তাহ খেটেছে কিন্তু হপ্তা পাবার জন্য ব্যগ্রতা উগ্রতা নেই।

চারিদিকে চেয়ে দেখে হরেন বেঁটে রোগা এম. এ. পাশ সুধীরকে হুকুম দেয়, এদের হপ্তা দিয়ে দাও।

সুধীর আমতা আমতা করে বলে, একটু মুস্কিল হয়েছে। হপ্তা দেবার ক্যাশ টাকা নেই। বঙ্গসদন ব্যাঙ্কের চেকটা ক্যাশ হয় নি।

: কেন হয় নি?

: ব্যাঙ্কটা ফেলে পড়েছে শুনলাম।

হরেন কটমট করে তার দিকে তাকায়। ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার অপরাধটা যেন তারই। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েকবার কান্থ আর তফাতে দাঁড়ানো মিস্ত্রি-মজুরদের দিকে চেয়ে দেখে।

সুধীরকে বলে, সেই টাকা থেকে দিয়ে দাও।

কোন টাকা সেটা আর বলার প্রয়োজন হয় না। সুধীর বলে, আচ্ছা।

হপ্তা পেয়ে কান্থ তাকে দেশী মদের দোকানে টেনে নিয়ে যায়।

: খা দিকিনি একটু আজ। কিরকম ম্যাদা মেরে যাচ্ছিস দিন দিন?

: শরীরে কেমন যুৎ পাচ্ছি না।

: হয়েছে কি?

: কে জানে। রোগ-ব্যারাম তো কিছু টের পাই না।

দু'নম্বর জলো মদের পাঁইট থেকে তার গেলাসে আউন্সখানেক ও নিজের গেলাসে চারপাঁচ আউন্স ঢেলে কান্থ বলে, এত কি ভাবিস বল তো? সারাক্ষণ ভেবে ভেবে তোর নিজেকে কাহিল লাগে। একটা মাগ নেই পুত নেই অত তোর ভাবনা কিসের? ফুঁ দিয়ে ফুর্তি করে বেড়াবি। এক একটা লোক থাকে মিছি মিছি ভেবে মরে।

মদটা গিলে হেসে বলে, খবর আছে, মস্ত খবর। ও মাসের তেরো তারিখে সাদি করছি।

কেশব উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করে, সেটাকে?

মুখ বাঁকিয়ে মাথা নাড়ে কান্থ, নাঃ, ওর বাপ শালা বড় একগুঁয়ে। কিছুতে রাজি হল না। এ অন্য একটা মেয়ে, মা দেখে পছন্দ করেছে।

ছোট একটা মনোহারী দোকানের মালিক, তার তের চোদ্দ বছরের কচি মেয়ে। মেয়েটাকে পছন্দ হওয়ায় কান্থর সংসার করার সাধ

জেগেছিল অথবা সংসার করার সাধ জাগায় মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছিল ঠিক করে বলা যায় না।

কানু প্রায় বছরখানেক চেষ্টা করছে, কিন্তু মেয়ের বাপ রাজী নয়। মেয়েকে, একটা খেড়ে মিস্ত্রীর হাতে সে কিছুতেই দেবে না। তার আসল আপত্তি অবশ্য এই নয় যে কানুর একটু বয়স হয়েছে। বেলাও তো কচি খুকীটি নেই। আসল কথা দোকানে কাজ করলেও সে হল ভদ্রলোক, কানু স্রেফ মজুর।

এতদিনে কানুর ধৈর্য্য শেষ হয়েছে। মায়ের পছন্দ করা যেমন হোক একটা মেয়েকে বিয়ে করে এবার সে সংসারী হবেই।

কথা কইতে কইতে সন্ধ্যা হয়ে আসে। কানু মাতাল নয়, মদ খাওয়া অভ্যাস দাঁড়ায়নি, কিন্তু মাঝে মাঝে যেদিন খায় সেদিন নেশা করার জন্যই খায়। মদ খেতে বসে কেশবের মত ছিটে-ফোঁটা একটু মালে একরাশি সোডা মিশিয়ে খাওয়ার পালা শেষ করার ধাত তার নয়। শেষ পর্য্যন্ত বেলাকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত করে মন বোধ হয় ভাল নেই, আজ বেশ খানিকটা গিলবে মনে হয়।

সন্ধ্যা হতে হতে নেশা জমে আসে কানুর।

সে বলে, চল না একটু ফুর্ত্তি করি?

কেশব বলে, বেশ বাবা তুমি, দুদিন বাদে বিয়ে করে সংসারী হবে—

কানু এক গাল হেসে বলে, তবে যাব না যা। আরও খানিকটা হৈ-চৈ করে ঘুমোব।

ঃ তুই খা। আমি গেলাম।

মদ খায় না বলে গর্ব্ব বোধ করেনা কেশব। বেশী খেতে ভয় করে তাই খায় না। এতে আর বাহাদুরী কিসের? বরং উল্টোটাই বলা যায়। দু'এক চুমুক খেলে একটু সতেজ মনে হয় নিজেকে।

একদিন একটু বেশী করে খেয়ে দেখলে হত কেমন লাগে। কিন্তু ভাবতেও যে তার আতঙ্ক হয়। একবার চড়া নেশা হলে হাজার ইচ্ছা করলেও আরতো রেহাই পাবে না নেশার প্রক্রিয়াটাকে ঘটতে দিতেই হবে। যদি যন্ত্রণা হয়, যদি মনে হয় মরে যাচ্ছে, তবু কিছু করার থাকবে না! নাইতে গিয়ে জলে ডুব দিয়ে পাঁকে আটকে যাওয়ার চেয়ে সেটা কি কম ভয়ঙ্কর অবস্থা?

যদি কোন মন্ত্র বা ওষুধ জানা থাকত যা প্রয়োগ করা মাত্র নেশা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়া যায়, কানুর মত বেশী খেয়ে পরীক্ষা একদিন সে করে দেখত কিরকম লাগে।

লেভেল ক্রসিংটা পার হলেই সহরতলীর একেবারে অন্যরকম চেহারা।

আলোয় ঝলমল বড় বড় অট্টালিকার সহর আর নোংরা পুরানো জীর্ণ ঘরবাড়ীর আধ অন্ধকার সহরতলীকে রেলপথটা পৃথক করে রেখেছে। এপারে সীমা কর্পোরেশনের। ওপারে আরম্ভ মিউনিসিপ্যালিটির।

দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। কেশবের লম্বা ঘুমের যেটা প্রধান কারণ। ধুলো আর গোবরে রাস্তাটা প্যাচ প্যাচ করছে। এখানে ওখানে গর্ত্ত, সেগুলিতে জলের বদলে জমেছে পাতলা তরল কাদা।

তবু কি ভিড় মানুষের!

শুধু ময়লা জামা কাপড় পড়া বা অর্দ্ধ উলঙ্গ গরীব মানুষেরই ভিড় নয়। ফিট ফাট বেশধারী বাবু মানুষ, স্যুট পরা সায়েব মানুষ এবং দামী শাড়ীপরা ভদ্রমহিলাও এই পথে হাঁটছে, দু'পাশের দোকানে কেনা কাটা করছে। খানিক এগিয়েই সিনেমা। শো চলছে, ভিতরটা বোঝাই, তবু বাইরে গিজ গিজ করছে ভদ্র-অভদ্র মেয়ে-পুরুষ।

পরের শো'র টিকিটের প্রয়োজনে এত আগে এসে ধন্না দিয়েছে।

চেনা মানুষ শুধায়, আজ সকাল সকাল ?

কেশব বলে, ছুটি পেয়ে গেলাম।

আপিসে কেরানীর খেয়ালে লটকানো শ্রান্ত চেনা মানুষ মন্তব্য করে, তোমার তো ভাই আরামের চাকরী। পরের মোটরে চেপে বেড়াও, খেয়ে দেয়ে খাটিয়ায় শুয়ে নাক ডাকাও।

: করে দেখলে আরাম টের পাওয়া যায়। বাবু হুকুম দেবে জোরসে চালাও। জোরসে চালিয়ে মানুষ চাপা দিয়ে তুমি শালা মার খাও আর জেলে যাও। কত আরাম !

এগোতে এগোতে আরও কমে আসে রাস্তার আলোর জোর, দোকানপাটের দেখা মেলে দূরে দূরে, বাড়ীগুলির গ্রাম্যতা আর জীর্ণতা বেড়ে যায়। এবরো-খেবরো খোয়ার তৈরী এই প্রধান রাস্তা থেকে দুপাশে পাড়ার মধ্যে ঢুকে গেছে ইঁটপাথরের গলিগুলি। বাগচী পাড়ার ফাঁকা যায়গার বাজারটা খাঁ খাঁ করছে দেখা যায়। এখানে সকালে একবেলা বাজার বসে।

বোসপাড়ার মোড়ে বিবর্ণ থামটার মাথায় টিম টিম করে জ্বলছে একটা অল্প পাওয়ারের বালব। এ যেন বাঁশঝাড় ডোবাপুকুর খোলার ঘরের বাগ মানা মানুষগুলিকে জানিয়ে দেওয়া যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বললেই কি এসপ্লানেডের মত ঝলমল করে ? এটাও বৈদ্যুতিক বাতি —এদিকে তাকিয়ে ঘরে লণ্ঠন আর ডিবরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো।

সন্ধ্যাদীপ জ্বালো খাঁটি তেল দিয়ে, শুদ্ধ তুলার সলতে বানিয়ে। সে আলোতে শান্তি আছে, স্নিগ্ধতা আছে। এ তো কাঁচের খেলনায় নিছক শুধুই আলো।

শরতের মনোহারী দোকানটায় কিন্তু একেবারে আধুনিকতম আলোর ব্যবস্থা। বালবের বদলে দুটো লম্বা কাঁচের মোটা নলের আশ্চর্য্য রকম

আলোয় যেন দিন আর পূর্ণিমা রাতের আলোর সমন্বয় ঘটেছে।

এরকম মনোহারী দোকান আশেপাশে কাছাকাছি আর নেই। এ এলাকাতেই নেই। অনেকটা পথ হেঁটে সীমান্তের লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে খাঁটি সহরের আওতায় গিয়ে এরকম দোকান খুঁজে নিতে হবে।

কিন্তু হেঁটে পয়সা খরচ করে সেখানে গিয়ে যে সৌখীন জিনিষটা দরকারী জিনিষটা যে দামে কিনবে—সে জিনিষটা সেই শরতের এই দোকানে।

যুদ্ধের শেষে দোকানটা খুলে শরৎ এই কথা ঘোষণা করেছিল—বিশ্বাস না হয়, পরখ কর। সহর থেকে যে জিনিষটা যে দামে আনবে ঠিক সেই দামে সেই জিনিষ যদি আমার কাছে না পাও, মাল আনার খরচ বলেও যদি দুটো পয়সা বেশী নিই, কান কেটে ফেলব তোমাদের সামনে।

শরতের দেওয়া বিড়িটা একবার টেনে দশবার কেশে বুড়ো আম্বিনাথ বলেছিল, দু'চারটে পয়সা বেশী নেবে বৈকি বাবা। মাল আনতে খরচ লাগে না ?

শরত হেসে বলেছিল, না ঠাকুর্দা ওটা ইস্কুলে শেখানো হিসেব, ব্যবসার হিসেব নয়। রোজ পাড়া থেকেই তিন চার শো লোক সহরে কাজ করতে যায় ভাখো না ? পেষ্ট বল ব্লেড বল পাউডার সিঁদুর যাই বল—ওরা তো আনবেই নিজেদের দরকারমত, অন্যেরা পয়সা দিলে তাদের জন্যও এনে দেবে। এক পয়সা বেশী নিই না বলেই লোকে এখান থেকে কেনে। দোকান করে লাভ নেই।

শরৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছিল।

তার দোকানে ডজন ডজন দাড়ি কামাবার ব্লেড কিন্তু মুখে তার

সাত আট দিনের খোঁচা খোঁচা গোঁপ দাড়ি। মাসে তার তিনচার বারের বেশী দাড়ি কামাবার সময় হয় কদাচিৎ।

কেশব বলেছিল, তা হলে তুমি দোকান চালাচ্ছ কি করে শরৎদা' ?

ঃ চালাচ্ছি লোকসান দিয়ে !

লোকসান দিয়ে শরৎ তার দোকান চালায় ! এমনি তার লোকসান দেবার নেশা। তার মত ঘরের পয়সা লোকসান দিতে চেয়ে দ্বিতীয় কেউ কিন্তু আশেপাশে এরকম মনোহারী দোকান দিতে পারে নি।

পাল্লা দেবার অনুযোগ এড়াতে রমেশ প্রায় দেড়শো গজ তফাতে ব্রজ দত্তের বাইরের ঘরে দোকান করার চেষ্টা করেছিল।

কদিন পরে দেখা গিয়েছিল রাতারাতি কে যেন দোকানের ভিতরে বিষ্ঠা ছড়িয়েছে, বাইরের তালার উপরেও দলা করে রেখেছে খানিকটা ওই জিনিষ।

রমেশ তাতেও না দমায় তিন দিন পরে রাত্রিবেলা তালা বন্ধ দোকানের ভিতরে পেট্রোলের আগুনে অর্দ্ধেক মাল পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

সবাই অনুমান করেছিল কীর্ত্তিটা কার। কিন্তু কে কি বলবে, কে কি করবে ? শরৎ নিজে কিছুই করে নি, শুধু টাকা খরচ করেছিল। বেশ মোটা টাকাই খরচ করেছে, এসব কাজ অল্প পয়সা ঢেলে করানো যায় না। হোক লোকসান, তার মত মনোহারী দোকান শরৎ কাউকে কাছাকাছি খুলতে দেবে না !

শরতের দোকানে দু'পয়সার নস্য কিনে কেশব কাছেই দক্ষিণ দিকে বোসপাড়ার রাস্তায় ঢোকে। বোসপাড়ার ছাড়া ছাড়া ভাবে থোক থোক ঘন বসতি। কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি হয় তো আট দশটি বাড়ী, তার পরেই খানিকটা ফাঁকা মাঠ পুকুর বাগান।

বড় বড় বাড়ীগুলি আর নতুন যে বাড়ী উঠেছে সেগুলিই কেবল বাড়ীর কোন থোকে না ঘেঁষে কম বেশী তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে।

রাত বেশী হয়নি। আলো নিভিয়ে বোসপাড়া ঘুমিয়ে পড়লেও রাস্তায় লোক খুব কম। কোন দাওয়ায় বসেছে কয়েক জনের আড্ডা কোন বাড়ী থেকে শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়ের চেঁচিয়ে পড়া, কোনো বাড়ীতে বাজছে রেডিও।

প্রকাণ্ড বট গাছটার লাগাও সাদা চুণকাম করা চৌকো দোতালা বাড়ী আবছা আঁধারে বড়ই রহস্যময় দেখায়, সংলগ্ন আটচালা দুটো সে রহস্যকে আরও ঘনীভূত করেছে। ভিতরে আলো জ্বলছে, মানুষের গলার আওয়াজ বাইরে ভেসে আসছে, নাকে এসে লাগছে রান্নাঘরের সম্ভারের গন্ধ। তবু তারা ভরা নীলাকাশ যেমন প্রকাশ্য হয়েও রহস্যময়, বৈশাখী গুমোট সন্ধ্যায় নিথর জমকালো বটগাছটা জীবন্ত হয়েও যেমন মৃতের মত ভয়ের রহস্যে ঘেরা, তেমনি সাধারণ ইটের বাড়ীটার ছায়াচ্ছন্ন শুভ্রতা যেন ছায়ালোকের প্রতীকের মত রহস্যানুভূতিকে নাড়া দেয়।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করে কেশব। প্রতিদিন বাড়ী ফেরার পথে মায়াকে জানান দিয়ে যায় তার বাড়ী ফেরার কথা। কিন্তু আজ যদি মায়া তাকে ভেতরে ডাকে? যদি টের পায় তার মুখের গন্ধ?

বেড়ার ওপর থেকে গানের কোমল টানের কত মিষ্টি মেয়েলি গলায় প্রশ্ন আসে, কে?

এতজন লোকের রান্না রাঁধতে রাঁধতেও মায়া তবে তার প্রত্যাশায় সত্যিই ঘন ঘন পথের দিকে তাকায়!

কেশব বলে, আমি।

: দাঁড়িয়ে কেন ? ভেতরে এসো ?

চৌকো দালানটির ভিতরে একরত্তি একটু পাকা উঠোন আছে। এপাশে প্রাচীর ঘেরা প্রশস্ত মেটে উঠান। মাচাই আছে তিনটি। লাউ কুমড়া আর উচ্ছে গাছের; কয়েকটা জবা গাছে ফুল ফুটে আছে। এদিকে দালান থেকে একটু তফাতে চালা ঘরে রান্নাঘর।

দালানের পাশ কাটিয়ে মায়া তাকে রান্নাঘরে নিয়ে যায়।

তার সঙ্গে ছিল গণেশ। একা রাঁধতে মায়ার ভয় করে।

গণেশের চিবুক ধরে চুমো খেয়ে মায়া বলে, এবার পড়বে যাও মানিক। পরীক্ষা আসছে যে ?

বছর দু'তিন আগেও ডিবরি জ্বলত রান্নাঘরে। আজকাল বেড়ার শালগাছের খুঁটিটার গায়ে লাগানো একটা ওয়াল-ল্যাম্প আলো দেয়।

দুয়ারের কাছে পিঁড়ি পেতে দিয়ে মায়া বলে, বোসো। মুখ যে বড় শুকনো দেখছি ? খুব খাটিয়েছে বুঝি আজ ?

: না। সারা দুপুর ঘুমিয়েছি।

: তবে ?

: একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি।

ল্যাম্পের রঙীন আলোয় ঠিক বোঝা যায় না কতকটা পাংশু হয়ে যায় মায়ার মুখ। চোখে পলক নেই দেখে, ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে গেছে দেখে অবশ্য সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় তার মনে প্রাণে কত জোরে ঘা লেগেছে। কি আলোড়ন উঠেছে।

মায়া রূপসী কিনা বলা কঠিন। লাবণ্যে ঢল ঢল করছে তার তেল চকচকে একরাশি কালো চুলে ঘেরা শ্যামল রঙের মুখখানা, আলগা তাঁতের শাড়ী ঘেরা শ্যামল কোমল অপুষ্ট দেহটা।

কেশব বলে, কি হল ?

মায়া বলে, কিছু খাবে ? একটু দুধ খাও, কেমন ?

কেশব হেসে ফেলে।—দুধ খাব !

: তা খাবে কেন, দুধ খেলে যে শরীরটা ভাল থাকবে ! ওই আবার কালী আসছে। দু'দণ্ড ভাল করে কথা কইবার যো নেই।

এগার বছরের কালী ইজের ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে। ডুরে শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে বেণী দুলিয়ে এসে সে আবদার জানায়, খিদে পেয়েছে ঘুম পেয়েছে কাকীমা। কত রাঁধবে তুমি ?

মায়া ঝংকার দিয়ে বলে, আ মরণ, রান্না বাকী আছে নাকি আমার ? সবাইকে ডেকে এনে জায়গা করে বোস, খেতে দিচ্ছি। লণ্ঠন আনিস।

ভাইবোনদের ডেকে আনতে কালী দালানের মধ্যে অদৃশ্য হতেই মায়া চট করে উঠে এসে আঁচল দিয়ে কেশবের মুখের ঘাম আর ক্লেদ মুছে নিতে নিতে বলে, বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে। এ কাজ ছাড়তে হবে তোমাকে। জামাকাপড় ছেড়ে এসোগে। দালানে ওদের সবাইকে বলবে কি হয়েছিল, আমিও শুনব।

তফাতে সরে গিয়ে বাঁকা চোখে চেয়ে বলে, মদ খেয়েছো, না ? গন্ধ পেলাম ?

: একটুখানি খেয়েছি, সামান্য।

থামে লটকানো ল্যাম্পের আলো এমন আরও কাছ থেকে মুখে পড়েছে। চোখ দেখে মনে হয় কিসের আলো কিসের রান্নাবান্না ঘরসংসার আর কিসের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সামান্য ওই মানুষটা ছাড়া তার কাছে কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

আহত ব্যাকুলতার ভাবটা কেটে যায় কয়েক মুহূর্তে। কামড়ে ধরা ঠোঁটে একটু হাসিও ফোটে।

ঃ যাক গে বেশ করেছো। ব্যাটাছেলে একটু আধটু খেলে কি হয়? আমি বুঝেছি, বিপদটা ঘটেছিল বলে তো?

আটচালাটার পিছনে কলাবাগান, ছোট একটা পুকুর আছে। তার পরেই কেশবদের বাড়ী। বাগান দিয়ে পুকুর পার ঘুরেও যাওয়া যায়।

মায়া বলে, না। রাত করে ওদিক দিয়ে গিয়ে কাজ নেই। সদর দিয়ে ঘুরে যাও।

দালানের একটা ঘরে রঞ্জন পড়ছিল। গোবিন্দের সে বড় ছেলে, একুশ বাইশ বছর বয়স। সে বলে, চললে নাকি মামু?

ঃ ঘুরে আসছি। কাণ্ড হয়েছে একটা, বলছি এসে।

গোবিন্দ পুজোর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

ঃ কিসের কাণ্ড কেশব?

বয়স প্রায় ষাট হবে গোবিন্দের। চুল অধিকাংশ পেকে গেছে। দীর্ঘ দেহ, ফর্সা রং পরণে পাটের কাপড়।

ঃ জামা কাপড় ছেড়ে এসে বলছি।

কেশবের বাড়ীতে অনেক লোক। তার বিধবা মা, তিন ভাই, দুটি বোন, মেজ ভায়ের বউ, তার দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে, একজন পিসী ও তার ছেলে।

একতলা বাড়ীটা জীর্ণ হয়ে এলেও ছোট ছোট কুঠরি আছে অনেকগুলি। কেশব একা একখানা ঘর দখল করলেও ঘরের জন্য অসুবিধা হয় না। তবে কেশবের সেজভাই প্রণব এবং পিসীর ছেলে ভোলার বিয়ে হলে ঘরের টানাটানি পড়বে।

পিসী পারলে রাত পোহালেই ছেলের বিয়ে দেয়। কেশবের ভয়ে কিছু করতে পারে না। কে জানে কি বিবেচনা কেশবের ব্যাটাছেলে তো রোজগার করবেই একদিন—চাকরী পেয়ে হোক ফিরিওলাগিরি

কুলিগিরি করেই হোক। পাকা ঘরে দুধে ভাতে কিম্বা ভাঙ্গা কুঁড়েতে আধপেটা শাকভাত খেয়ে জীবন কাটবে মানুষ যার যেমন অদৃষ্টে আছে।

কিন্তু বয়স গেলে যে বিয়ে করার সুখটাই নষ্ট হয়ে গেল জীবনে? দুদিনের জন্য হলেও এই তো বয়েস বিয়ের আসল রস আর আনন্দ পাবার। জীবনটাই তো অস্থায়ী মানুষের।

কেশবের নিজের ফস্‌কে গেছে কিনা, অন্যের জীবনে এ রস আর আনন্দের কোন দাম তার কাছে নেই।

সহর থেকে এটা ওটা আনার ফরমাস ছিল দু'তিন জনের। বিমলা জিজ্ঞাসা করে, খালি হাতে এলি, পাটি আনিস নি তো?

কেশব বলে, নাঃ। আমি বলে অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে মরছিলাম—

ঃ মাগো! বলিস কি রে? ভগবান দীনবন্ধু!

ফরমাসী জিনিষ না আনা হয়ে থাকলে যারা অনুযোগ দেবার জন্য উদ্যত হয়েছিল তার একেবারে চুপ করে যায়।

সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে কেশব পুকুরে গিয়ে স্নান করে আসে। তাড়াতাড়ি না যাওয়াই ভাল। গোবিন্দের আধডজন ছেলেমেয়েকে খেতে বসিয়েছে, ওরা খেয়ে না উঠলে মায়া এসে শুনতে পাবে না তার দুর্ঘটনার কাহিনী।

সে ফিরে যেতেই গোবিন্দ বলে, তুমি যে আমাদের ভাবিয়ে রেখে গেলে। হয়েছে কি? এসো বোসো।

দাওয়ায় মাদুর বিছানো হয়। কেশব বসতেই সকলে তাকে ঘিরে বসে। মায়া নিঃশব্দে গোবিন্দের পিছনে বসে, যেখান থেকে মুখ দেখা যায় কেশবের।

কেশবের দুর্ঘটনার কথা বলতে সুরু করলে ঘরের ভেতর থেকে

অবলা ডেকে বলে, আরেকটু গলা চড়িয়ে বল তো কেশব। তোরা কেউ টুঁ শব্দ করবি নে, মেরে ফেলব।

মেরে ফেলবে! ছেলেমেয়ে ঘর সংসার সবই অবশ্য অবলার। পক্ষাঘাতে অর্দ্ধেকটা দেহ অবশ হয়ে সে আজ কয়েক বছর বিছানায় পড়ে আছে।

সে বিছানা নিয়েছিল বলে মায়া এসে জায়ের সংসার ঘাড়ে নেয় নি। অবলার রোগটা হয় মায়া এখানে আশ্রয় নিতে আসার কয়েক মাস পরে।

কেউ কেউ তখন বড় ভয়ানক ইঙ্গিত করেছিল। কবিরাজের মেয়ে, কত তুকতাক ওষুধ পত্র জানে। অবলা উঠে চলে ফিরে বেড়াতে পারলে তাকে দাসী হয়ে থাকতে হয় জায়ের। কে জানে অবলার রোগটা সে-ই ঘটিয়েছে কিনা!

নইলে সুস্থ সবল মানুষটা খায় দায় হেঁটে বেড়ায় কাজ কর্ম্ম করে, এমন হঠাৎ কেন অর্দ্ধেক অঙ্গ তার অবশ হয়ে যাবে?

কিন্তু লোকে কাণে তোলে নি সে ইঙ্গিত। অন্যকে কাঁদতে দেখলে যে না কেঁদে পারে না, নিজেকে ভুলে সকলের এমন প্রাণপাত সেবা যত্ন যে করে যায় দিনের পর দিন, সকলের জন্য যার বুকভরা দরদের শত শত পরিচয় নিত্যই পাওয়া যায়, নিজের স্বার্থে সে কখনো পক্ষাঘাত ঘটাতে পারে একটা মানুষের!

জোরে জোরে কেশব দুর্ঘটনার কাহিনী বলে যায়। বড় বড় চোখ মেলে তার মুখের দিকে চেয়ে মায়া যেন গিলতে থাকে তার কথাগুলি।

বাড়ী ফেরার সময় আরও যেন ওজন বেড়েছে মনে হয় সারাদিনের বিষাদ অবসাদ আর ভয়ের। এবার যেন কষ্ট হচ্ছে বেশী। রাত বেশী হয় নি। কিন্তু বোসপাড়ার ভিতরের দিকে এই গলি-রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে। নীড়ে নীড়ে জীবনকে গুটিয়ে নিয়েছে মানুষ

গামছার বোঝা কাঁধে নিয়ে ফিরিওলা অধর সারাদিন পথে পথে ঘুরে বাড়ী ফিরছিল।

বলে, কেশববাবু মা'র একটা গামছা ফরমাস ছিল।

ঃ মাকেই দিও।

দামটা ?

দামও মা-ই দেবে।

এদিকে খানিক তফাতে শেষ হয়েছে বৈদ্যুতিক এলাকার সীমানা। শরতের রেডিও ক্ষীণ ভাবে শোনা যায়। গানের কথাগুলি বোঝা যায় না কিন্তু সুর শুনে মনে পড়ে পরিচিত গানের কথা—ললনাকে অনেক বার গাইতে শুনেছে।

দক্ষিণ থেকে ভেসে আসছে সাধক ভুবনেশ্বরের চড়া গলার কালী সঙ্গীতের সুর। তারও কথাগুলি ধরা যায় না কিন্তু সুর শুনে মনে পড়ে যায় শোনা গানের জানা পদ।

বাড়ী গিয়ে কি করবে? বই পড়া গল্প করা সহ্য হবে না। ঘুম আজ রাতে আসবে কি না, কখন আসবে জানা নেই।

ক্ষোভে বুকটা জ্বালা করে কেশবের। কত বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ কলকাতা সহরে। পাড়াতেই আছে নগেন ডাক্তার, সোমনাথ কবিরাজ, কতলোকের চিকিৎসা করছে। তার কষ্ট দূর করার সাধ্য ওদের নেই।

গিয়ে বললে ঘুমের ওষুধ দেবে। বেশী মদ খেতে তার ভয় করে, ঘুমের ওষুধ খেতে তার আরও বেশী আতঙ্ক।

এ ভয় না কাটিয়ে তাকে ঘুমের ওষুধ দেবার কি মানে আছে? এ যেন মুখ যার সেলাই করা তাকে অমৃতের পাত্র দিয়ে পান করতে বলা।

ধীরে ধীরে তাদের বাড়ী ছাড়িয়ে কেশব এগিয়ে যায়।

ভুবনেশ্বরের বাড়ী বলতে শুধু দু'খানা ঘর। বছর পনেরো আগে বাড়ীটা তৈরী হয়েছিল, আজ পর্য্যন্ত বাইরের ইটের উপর আস্তর পড়ে নি। ছাতে রেলিং নেই। ছাতে উঠবার জন্য বাইরে সরু একটা আলগা কাঠের সিঁড়ি বসান আছে।

দুয়ার খুলে মোহিনী বলে, কেশব নাকি? কি ভাগ্যি! এসো এসো।

পাতলা একখানি শাড়ী আলগা ভাবে গায়ে জড়ানো। এবারও কেশবের যেন চমক লাগে। কয়েক মুহূর্ত্ত চোখ ফেরাতে পারে না। তার মনে পড়ে অজন্তার নারীমূর্ত্তির কথা।

আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে মোহিনী বলে, ভারি গরম পড়েছে।

: ভুবনদা ছাতে না?

: শুধু ভুবনদার সঙ্গেই কথা কইতে আসা হয় বুঝি? আমাকে পছন্দ হয় না?

: পছন্দ হয় বলেই তো ভয় করে।

খোলা ছাতে গামছা পরে ভুবনেশ্বর বসেছিল।

: এসো কেশব। ধোয়া ছাত, বসে পড়।

: গান থেমে গেল ভুবনদা?

: গান কখনো থামে রে পাগল? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অবিরাম গান চলেছে। ওই গান শুনতে শুনতে কখনো সখ হয়, নিজে নিজের গান একটু শুনি।

: ও গান আমরা শুনতে পাইনা কেন?

: কান পাতলেই শুনতে পাবে। কানের বাইরের দুয়ারটা বন্ধ করে আগে তালা দেবে। হট্টগোলের আওয়াজটা আগে বন্ধ করতে হবে তো? নইলে অত আওয়াজে গান তলিয়ে যাবে না?

: ভোগীর পক্ষে কি তা সম্ভব?

: খুব সম্ভব। ভোগ করার কায়দা জানলেই হল। আমিও তো ভোগ

করি। ভোগ করি কিন্তু আমি কিছুই চাই না। বলে কিনা পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা। আমি পুত্রও চাই না, পিণ্ডের কামনাও রাখি না।

কেশব ধাঁধায় পড়ে বলে, কি রকম হল? ভোগ করেন অথচ—

ভুবন হাসে।

: ওইটেই তো আসল কথা ভাই। ভোগ আমি করি কিন্তু ভুলি না যে, আমায় ভোগ করায় তাই ভোগ করি।

কেশব চুপচাপ ভাবে। মাথার উপরে তারা ভরা আকাশ পুরানো হয় না কিন্তু চারিদিকে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো বাড়ী আর গাছপালার পৃথিবীটা যেন জীর্ণ পুরানো হয়ে গেছে।

: আমার অসুখটা সারিয়ে দেবেন ভুবনদা?

মোহিনী বলে অসুখ? তোমার আবার কি অসুখ গো?

মোহিনী কখন এসে সিঁড়ির মাথায় বসেছিল তারা টের পায় নি। কেশব বলে, সেটাই তো জানিনা। মাথা ঘোরে, ঘুম হয় না, ভেতরে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা বোধ হয়—

মোহিনী বলে, বিয়ে থা করে সংসারী হও, সেরে যাবে।

ভুবন বলে, আমি বুঝেছি তোমার অসুখটা কি। তোমার রোগ হল অবিশ্বাস। এ রোগ সারাতে হলে তোমার নিজেকে ছোট করতে হবে, বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি সাহায্য করতে পারি।

মনে কিন্তু সাড়া জাগেনা কেশবের।

অবিশ্বাস? এক অজ্ঞাত দুর্জয় শক্তিতে অন্ধ বিশ্বাসের অভাব? কত অসংখ্য মানুষের এ বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে। কই, তারা তো ভোগে না তার মত রোগে? হাসি আনন্দের অভাব তো নেই তাদের জীবনে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন বালাই নেই কানুর। সে তো দিব্যি আছে—খাটে খায় দায় আর ঘুমায়।

মা করুণ চোখে তার খাওয়া দেখতে দেখতে বলে, এই খেয়ে কি করে এত খাটিস তুই ? এই বয়সে তোর এই খাওয়া !

: শরীরটা ভাল নেই।

: আমারও মরণ নেই।

কিছুই করার নেই, খেয়ে উঠে কেশব শুয়ে পড়ে। গোবিন্দের বাড়ীর দিকে তার ঘরের জানালা। জানালার পাশে চৌকিতে বিছানা পাতা। জানালার দিকে মুখ করে শুয়ে সে আকাশ পাতাল ভাবে।

একে একে আলো নেভে এ বাড়ীর ও বাড়ীর। রাত বেড়ে চলে।

তখন আলো জ্বলে মায়ার ঘরে। জানালায় একটি লণ্ঠন বসানো আছে দেখা যায়। খানিক পরে নিভে যায় আলোটা।

মায়ার সংকেত। কিন্তু আজ যেন মায়ার ডাকে সাড়া দেবার ক্ষমতা নেই কেশবের। কি হবে গিয়ে? মায়া ওই এক কথাই বলবে—যে কাজে এমন প্রাণের ভয় সে কাজ তুমি ছেড়ে দাও !

কেশব ওঠে না। খানিক পরে তাকে চমকিত অভিভূত করে মায়া এসে তার জানালা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

ঘুমিয়েছো নাকি ?

হঠাৎ মমতার বন্যায় প্রাণটা যেন গলে যেতে চায় কেশবের। তার জন্য এও সম্ভব করতে পারে মায়া ? সন্ধ্যা রাত্রে চালা ঘরে একা রাঁধতে যার ভয় করে, ছেলেমেয়ে একজনকে পাহারা দরকার হয়, প্রায় মাঝ রাত্রে সে এসেছে কলাবাগান আর পুকুর পাড়ের অন্ধকার দিয়ে একা !

: কি আশ্চর্য্য, তোমার ভয় করল না ?

: করল না ? কি করব ? আজ আমার এত জরুরী কথা ছিল, আজকেই তুমি গেলে না।

: শরীরটা ভাল নেই আজ। চলো তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

ঃ পাগল হয়েছো? এত রাতে সঙ্গে যাবে, কারো যদি চোখে পড়ে? একা হলে বলতে পারব ঘাটে এসেছিলাম।

একমুহূর্ত্ত ভেবে বলে, শরীর খারাপ, আজ তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমায় কথা দাও কাল থেকে গাড়ী চালাতে যাবে না? নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোইগে। কথা তোমাকে দিতেই হবে নইলে—

ঃ কাজ না করলে খাবো কি?

ঃ অন্য কাজ করবে।

কেশব সস্নেহে বলে, অন্য কাজ কি জানি? আচ্ছা পাগলার পাল্লায় পড়েছি। শোন, কাল আমি বেরোব কিন্তু গাড়ী চালাব না। গাড়ীটা কাল মেরামত হবে। এখন শোওগে যাও, কাল কথা হবে'খন। আচ্ছা একটু দাঁড়াও।

কেশব খিড়কির দরজা খুলে বাইরে গিয়ে বলে, তুমি একলাই যাও, আমি একটু এগিয়ে দিচ্ছি। ভয়টয় পাবে শেষকালে।

তারপর বলে, ঘরে আসবে?

মায়া বলে, না। দরজা খোলা রেখে এসেছি। জানাজানি হয়ে যাবে।

ঃ জানাজানি তো একদিন হতেই পারে। কি করবে তখন?

ঃ কি আর করব? তাড়িয়ে দিলে তুমি খাওয়াবে। না খাওয়াও ঝি খাটব, ভিক্ষে করব।

গাড়ী বার হবে না, ভোরে অনিমেষের বুড়ী মাকে গঙ্গায় নিয়ে যাবার জরুরী তাগিদ নেই। কানু যাবে আটটার পর। আরও দেরী করে গেলে চলে। কিন্তু সারারাত গরমে ছটফট করে অভ্যাস মত অন্ধকার থাকতে উঠে কেশব ঘাটে নাইতে যায়।

কর্ম্মচঞ্চল কোলাহল মুখর সহর আবার তাকে টানছে। ভিতরে

কি যেন চাপ দিচ্ছে তাড়াতাড়ি এই শান্ত ভাবালু পরিবেশ ছেড়ে লেভেল ক্রসিংএর ওপারে পালিয়ে যেতে। অনিমেষের রঙীন তকতকে বাড়ীর লনের পাশে গ্যারেজের লাগাও তার পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে গিয়ে না বসলে, বাড়ীর ভিতর থেকে ললনার গানের সুর কানে না এলে তার স্বস্তি নেই। কিন্তু দিনান্তে আবার যে সে ক্রমে ক্রমে পাগল হয়ে উঠবে এখানে ফিরে আসতে ?

ঘাটে দাঁড়িয়ে গা মুছছে মায়া, একটা গেলাস হাতে নিয়ে এসে বলে, টাটকা দুধ দুয়ে নিয়ে এলাম। এক চুমুকে খেয়ে ফেল। রোজ তোমাকে এক গ্লাস দুধ খেতে হবে।

: হঠাৎ দুধ কমে গেলে বাড়ীতে কি বলবে ?

: কত হিসেব রাখে সবাই ! খানিকটা জল মিশিয়ে নেব।

তিন

নিয়মিতভাবে না হলেও পালা করে কমে বাড়ে—কেশবের অদ্ভুত রোগটা।

হয় তো বেশ ভালই আছে ক'দিন। শরীর তাজা, মনে ফুর্তি, জোর করে ঘুম ঠেকিয়ে মায়ার সংকেতের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করা, জীবনটা ধন্য মনে করা যে এই রুক্ষ কঠোর স্বার্থপর হৃদয়হীন জগতে মায়ার এমন ভালবাসা পেয়েছে, এমন ভাবে সে ভালবাসতে পেরেছে মায়াকে।

স্বপ্নের মতই কি ভাবে কি কারণে যেন শেষ হয়ে যায় সুস্থ সুন্দর দিনগুলি। আসে নিদারুণ দুঃস্বপ্নের পালা।

মাথা ঘোরে। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে হঠাৎ ধরাস করে ওঠে বুকটা। এলোমেলো খিদে পায়, কখনো অসহ্য চনচনে খিদে,

কখনো একেবারেই খিদের অভাব। হজম হয় না। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে, বারবার জল খেলেও ভেজেনা। ঢোঁক গিলতে কষ্ট হয়।

ঘুম আসে না।

আর ওই অজানা আতঙ্কের মত কি যেন চেপে ধরে রাখে প্রাণটাকে।

জীবনটা মনে হয় যন্ত্র। মায়ার ভালবাসাকে মনে হয় যান্ত্রিক। কিছুই নেই তার এই প্রেমে। দরদ করা তার স্বভাব, পাঁচজনকে যেমন আপনা থেকে স্নেহ করে, তাকেও তেমনি আপনা থেকে ভালবাসে।

ডাক্তার তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করছে দেহের যন্ত্র এবং উপাদান সবকিছু। কোন খুঁত মেলেনি।

কেন তবে এমন হয়?

যখন ভাল থাকে নতুন কিছুই তো ঘটে না যে, বলা যাবে যে সেজন্য সব উল্টাপাল্টা হয়ে গেল।

দিন রাত্রি ক'টা ভাল কাটছে। অন্ধকার থাকতে উঠে দেহমনে সুখ আর স্বস্তি নিয়ে কাজে যাচ্ছে।

ঠিক তেমনি আরও একটা দিন কাটল।

তারপর ভোরে ঘুম ভেঙ্গেই মনে হল দেহ মনে স্বস্তি নেই।

সুরু হল দুঃখের দিন।

মায়া বলে, তার এই অসুখের জন্যই গোড়ায় নাকি তার খুব মমতা হত, প্রাণ কাঁদত। ইচ্ছা হত, আদর যত্ন দিয়ে সেবা করে তার অসুখ সারিয়ে দেয়, রাতে ঘুম না এলে শিশুর মত তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

সেই ভাবটাই তারপর অন্য রকম হয়ে গেছে।

: তুমি যদি আমার সত্যিকারের স্বামী হতে, সব সময় খোলাখুলি ভাবে তোমার সেবা করতে পারতাম—

: অসুখ সারিয়ে দিতে ?

: একমাসও লাগত না। তোমার অসুখ আর কিছুই নয়। তুমি ভারি মায়াবী মানুষ। সংসারে কারো কাছে মায়া মমতা পাওনি বলে তোমার এরকম হয়েছে। এত খাটবে পয়সা আনবে খাঁটি একটু দরদ পাবে না—এটাই তোমার সয় না।

: কেন, মা—?

: তোমার মা ? আমি জানি সব। তোমার চেয়ে তোমার ভায়ের জন্য মার দরদ বেশী। তুমি কাঠখোট্টা মানুষ, মোটর চালাও, স্নেহ দিয়ে তুমি করবে কি !

স্নেহের কাঙ্গাল বলে ? কঠিন বাস্তব নিয়ে তার জীবন কিন্তু ভিতরে তার স্নেহমমতার জন্য আকণ্ঠ পিপাসা।—এ পিপাসা মেটেনি বলে তার দেহমন বিগড়ে গেছে ?

কিন্তু কই, সে তো টের পায়নি এই মারাত্মক তৃষ্ণা। বরং নিজের ঘরে পরের ঘরে যে স্নেহ মমতার ছড়াছড়ি দেখেছে তাকে মনে হয়েছে কুৎসিত ন্যাকামি। এ স্নেহ এ মমতা উথলায় নিছক বাস্তব দেনাপাওনার নিরিখে। মা বল, বৌ বল, ভাই বোন বন্ধু বল, যতটুকু প্রতিদান পাবে বা পাওয়ার আশা রাখবে ঠিক ততটুকুই দরদ দেবে প্রতিদানে।

প্রথম বয়সে বুকটা জ্বালা করত। কিন্তু সে ছেলেমানুষি ক্ষোভ মিটে গেছে বহুদিন আগেই। এটাই যখন নিয়ম সংসারের এজন্য আপশোষ করার তো কিছুই নেই। স্বামী ছাড়া গতি নেই বলে, একদিন স্বামীর কপাল ফিরবে আশা করা ছাড়া উপায় নেই বলে, সীতা

সাবিত্রী শৈব্যারা যদি চরম দুঃখ বরণ করে থাকে তাতে তো এরা ছোট হয়ে যায় না।

জীবন যখন যেমন তখন তার তেমনি রীতিনীতি। এই রীতিনীতি ঠিকমত ধরতে পারা, আগামী সুখের দিনের জন্য দুঃখের দিনের তপস্যা বরণ করা, এতো সহজ কথা নয়, তুচ্ছ কথা নয়।

ক'জন এটা পারে?

না, পরীক্ষা পাশ করেও চাকরী জোটাতে পারেনি বলে, রোজগার করতে না পেরেও সকলের কাছে চোর বলে থাকতে রাজী হয় নি বলে, সবার স্নেহ মায়া কেন বিষিয়ে গিয়েছিল সেজন্য তার কোন নালিশ নেই। যে মা তখন খেতে বসলে অবজ্ঞার সঙ্গে থালায় ভাত তরকারি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত, এক পয়সা রোজগার না করে পাঁচজনের অন্ন ধ্বংস করার অনুযোগ দিত, সেই মা আজ খাওয়ার সময় সামনে বসে কম খাওয়ার জন্য কাঁদ কাঁদ হয়ে অনুযোগ দেয় বলে তার এতটুকু দুঃখ বা জ্বালা হয় না।

এটাই নিয়ম স্নেহ মমতার। মা তার সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়ে অনিয়মকে বরণ করার শিক্ষা দীক্ষা পায়নি, সেটা কার দোষ? মায়ের নিশ্চয় নয়!

অবাধ্য দুরন্ত শিশুকেও মা শাসন করে। পাশ করে চাকরী করে পয়সা আনার বয়স হলেও ছেলে রোজগার না করে ঘরের ভাত খেলে মা বিতৃষ্ণা দেখাবে না? সে অধিকার তার পুরোমাত্রায় আছে।

সেই ছেলে আবার মোটর গাড়ী চালিয়ে হোক, আর চুরিডাকাতি করে হোক রোজগার করে এনে সংসারে দিলে তাকে স্নেহ জানাবার অধিকারও মার পুরোমাত্রার আছে।

মায়ার কথার কোন মানে হয় না। স্নেহ মমতা পাওয়া না পাওয়া নিয়ে তার কোন নালিশ নেই!

স্নেহের অভাবে কারো এরকম অসুখ হয়!

কবে সুরু হয়েছিল অসুখ? কিসে এর সূত্রপাত?

তন্ন তন্ন করে নিজের অতীত জীবন খুঁজে কেশব এ প্রশ্নর জবাব পায় না। মনে হয় এ যেন তার জন্মগত বিকার, সারা জীবনে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে।

বয়স বাড়ার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে প্রকট হয়েছে লক্ষণগুলি। ধীরে ধীরে তার জীবনের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। নিজের বড় হওয়াটা যেমন খেয়ালে আসে নি বড় হওয়ার আগে, অসুখের বাড়টাও তেমনি খেয়াল করেনি লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হওয়ার আগে।

আজ যে ভোঁতা কষ্টকর ঝিম ধরা ভাব ঘুম ঠেকিয়ে রাখে, এটাই হয় তো ছিল আগেকার দিনের সেই রাত জেগে ব্যর্থতা আর হার-মানার হিসাব কষতে কষতে লজ্জা আর গ্লানি বোধ করা। আজ যে আতঙ্কের জন্য ঘুমের ওষুধ খেতে পারে না, একদিন এটাই হয় তো ছিল তার অন্ধকারের ভয়।

যাই হোক, মোট কথা এই যে তার জীবন আর এই অসুখ এক সাথে গাঁথা।

এ জীবনে তার রেহাই নেই।

ললনা খুব মিশুক।

ব্যাপকভাবে সামাজিক মেলামেশাটা বাড়ীর সকলেরই ধর্ম্ম, একমাত্র অনিমেষের বুড়ি মা ছাড়া। কেবল ছুটির দিন নয়, অন্যান্য দিনেও প্রায়ই সন্ধ্যার পর সকলে আত্মীয় বন্ধুর বাড়ী যায়।

শনিবারের বৈঠকটা এক বিশেষ ব্যাপার, অনেক লোক সমাগম হয়। শনিবার ছাড়াও লোকজন আসে।

হয় বাড়ীতে নয় বাইরে আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হাসিগল্প প্রায় একদিনও বাদ যায় না।

গোড়ায় কেশব ভেবেছিল যে ঘনিষ্ঠ মানুষ ও পরিবারের বুঝি সীমা সংখ্যা নেই এদের। তারপর অল্পদিনেই সে টের পেয়েছে যে শিক্ষিত অভিজাত সমাজের বহু লোকের সঙ্গেই হয় তো জানাশোনা আছে কিন্তু ঘনিষ্ঠতার সীমানাটা সঙ্কীর্ণ। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পরিবার ও কয়েকজন বিশেষ মানুষের সঙ্গেই এদের নিয়মিত মেলামেশার আদান প্রদান চলে।

ললনার মেলামেশার সীমানা আরও বিস্তৃত। ভাল গান জানে বলে সর্ব্বত্রই তার আদর ও কদর বেশী। লোকের বাড়ীতে ও বাইরে নানা উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানে তাকে নেওয়ার জন্য সর্ব্বদাই টানাটানি চলে।

তাছাড়া, তার বন্ধু এবং বান্ধবীর সংখ্যাও প্রচুর। তার কারণটা বোধ হয় এই যে বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু বা বান্ধবী তার একজনও নেই!

অনেকের সঙ্গে সাধারণভাবে মিলতে মিশতে সে যেন এত ব্যস্ত যে বিশেষ ভাবে কারো সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হবার সময় বা সুযোগ পায় না।

তার সখাও নেই, সখিও নেই।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ললনাকে নিতে গাড়ী আসে। গানের খাতিরে তার এই দাবী সাগ্রহে মেনে নেওয়া হয়। ঘরের গাড়ী চড়ে আসরে বৈঠকে সভায় সম্মেলনে গান গেয়ে গেয়ে বেড়ালে চলবে কেন। পেট্রল খরচের হিসাবটাও তো খেয়াল রাখতে হবে।

মাঝে মাঝে অবশ্য গানের আসরে নিয়ে যাবার জন্য কেশবকেও গাড়ী বার করতে হয়।

সব সময় সকলকে তো আর গাড়ী পাঠাতে বলা যায় না। ড্রয়িং রুমে প্রবেশাধিকার না থাক, গাড়ীতে তো ড্রাইভারকে কাছে রেখেই দিনের পর দিন চালাতে হয় নানা জনের সঙ্গে হাসি গল্প আলাপ আলোচনার পালা। কার সঙ্গে ভাব বেশী কার সঙ্গে কম সেটাও গোপন রাখা যায় না ড্রাইভারের কাছে।

কেশব টের পায়, হাসিখুসী মিশুক বটে ললনা কিন্তু সকলের জন্যেই ঘনিষ্ঠতার একটা স্পষ্ট সীমা সে টেনে দিয়েছে, সে সীমা পেরিয়ে নিজেও কখনও এগোয় না, অন্যকেও এগোতে দেয় না।

নরেশকে পর্য্যন্ত নয়। অথচ প্রথম দিকে তার ধারণা হয়েছিল, নরেশের সঙ্গে বুঝি ললনার খুব ভাব, হয় তো বা প্রেমেরই কাছাকাছি!

এতবার কেউ বাড়ীতে আসে না। এত বেশীবার আর কারও সঙ্গে ললনা একা গাড়ীতে চাপে না।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে কেশব জেনেছে, ঘনিষ্ঠতা চায় কেবল নরেশ, ললনা নয়।

নরেশ একটা ওষুধের কারখানায় বেশ ভাল মাইনেতেই চাকরী করে।

সেদিন ললনাকে মনে হচ্ছিল খুব শ্রান্ত। মুখটা বিবর্ণ দেখাচ্ছিল।

মন্দ্রার জন্মদিনের উৎসবে গিয়ে ললনা তাকে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে। আধঘণ্টার মধ্যে সে বাড়ী ফিরে যাবে।

ঘণ্টাখানেক পরে নরেশের সঙ্গে সে এসে গাড়িতে ওঠে। তেমনি শ্রান্ত বিবর্ণ দেখালেও হাসিখুসী ভাবটা সে যেন জোর করে বজায় রেখেছে।

কেশব শোনে কি কথার জের টেনে ললনা বলছে, দশজন সুস্থ মানুষের সঙ্গে না মিশলে আমার দম আটকে আসে।

: আমি কি অসুস্থ মানুষ? আমার সঙ্গে একটু বেড়ালে দোষ কি?

: এই তো বেড়াচ্ছি। আপনাকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আমি বাড়ী যাব। বন্ধুর বাড়ী উৎসব চলছে, বাড়ীতে জরুরী কাজ না থাকলে চলে আসি?

: কি কাজ?

: আছে একটা ঘরোয়া ব্যাপার।

কেশব টের পায়, নরেশ আহত হয়ে চুপ করে গেল।

ললনা বলে আপনি তো খুব বড় কেমিষ্ট। বাতাসে অক্সিজেনের পার্সেণ্টেজ আরও বেশী হল না কেন বলতে পারেন? অক্সিজেন আমাদের এত দরকারী!

চট করে আড় চোখে কেশব নরেশের মুখ দেখে নেয়। একটু বিষণ্ণ হাসি ফুটেছে নরেশের মুখে।

: যাক, তবু জানা গেল তোমার মায়া আছে। মনে কষ্ট দিয়ে অন্ততঃ ছেলে-ভুলানোর চেষ্টাও কর।

কিন্তু সত্যই কি ছেলে-ভুলানো প্রশ্ন করছিল ললনা?

পরদিন আপিস কলেজ যাবার বেলায় নিমাই এসে জানায়, ললনা কলেজ যাবে না। ডাক্তারকে ফোন করা হয়েছে।

: ইস্! কিরকম যে করছে শ্বাস টানার জন্য। দেখলে এমন কষ্ট হয়। কেশব বলে, রাতে ডাক্তার এসেছিল শুনলাম!

: সে তো পেট ব্যথার জন্য। এখন আবার হাঁপানি উঠেছে।

প্রতিমাসে ললনা খুব ব্যথা ভোগ করে এটাই জানা ছিল কেশবের। এসময় তার যে আবার হাঁপানিও হয় আজ সেটা প্রথম জানতে পারে।

বোসপাড়াতেই তিনজন হাঁপানি রোগীকে সে চেনে, তারা সবাই পুরুষ। তার পিসেরও এই রোগ ছিল। পিসে মরবার পর পিসীর মাথায় কেমন একটু গোলমাল দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে সে এমন ভাব করে যেন হাঁপানির আক্রমণ হয়েছে—খুব শ্বাস কষ্ট। ডাক্তার দেখিয়ে জানা যায় রোগটা তার মানসিক।

অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করে কেশব বাড়ীর ভিতরে যায়। উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনিমেষ বিরস মুখে সিগারেট টানছিল।

কেশব বলে, একটা কথা বলছিলাম আপনাকে। আমার পিসে মশায়ের হাঁপানি ছিল। তিনি একটা খুব সোজা প্রক্রিয়া করতেন, তাতে উপকার হত দেখেছি।

: ডাক্তার এসে ইনজেকসন দেবে।

: আমি বলছিলাম কি, প্রক্রিয়াটা খুব সোজা, করে দেখলে কোন ক্ষতি নেই। তিনগাছা চুল গোড়া শুদ্ধ তুলে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া—শুধু এইটুকু। অনেক সময় পিসেমশায় আশ্চর্য্য ফল পেতেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে শ্বাস টানার কষ্ট কমে যেত।

অনিমেষ খানিকক্ষণ নীরবে চেয়ে থাকে।

তারপর বলে, নাঃ আমার যাই মনে হোক, করে দেখলে কোন ক্ষতি নেই। অ্যাজমাতে কি জান অনেকখানি নিওরোটিক ব্যাপার আছে। একটা মেণ্টাল এফেক্ট হয়তো হয়। তুমিই বরং বল ললনাকে। তোমার পিসেমশাই উপকার পেতেন একথাটায় জোর দিও, বুঝলে?

ললনার মুখ দেখে, একটু বাতাসের জন্য তার প্রাণান্তকর কষ্ট দেখে কেশবের নিজের দেহমনের সমস্ত অস্বস্তি আর কষ্টবোধ যেন মিলিয়ে যায়।

তার কথা শুনে ললনা হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, করে দেখি কি হয়। আমাকে চুল তুলতে হবে?

ঃ না, অন্যে তুললেও চলবে। আপনার সামনে চুল আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে।

আপনিই তুলে পোড়ান।

একটু বাতাসের জন্য প্রাণান্তকর যাতনায় ললনার তখন অন্য সব বোধশক্তি চাপা পড়ে গেছে, কেশব একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই তার মাথা থেকে তিনগাছা চুল তুলে নেয়। চুল তিনটি দলা পাকিয়ে একটুকরো কাগজ জ্বালিয়ে তার মধ্যে ফেলে দেয়।

কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় ললনা এতটুকু আরামও পায় না। কেশবের পিসের মত গভীর কুসংস্কারের জোরালো অন্ধ বিশ্বাস সে কোথায় পাবে।

ডাক্তারকে এসে ইনজেকসন দিতে হয়।

কিছু কাল থেকে আরেকজন ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করছে ললনার সঙ্গে।

তার অভিযানটা সুরু হয়েছে হঠাৎ।

বঙ্কিম আজ মস্ত লোক, তার অনেক ক্ষমতা, অনেক প্রতিপত্তি। অনিমেষের চাকরীর সঙ্গে সোজাসুজি তার সংযোগ নেই কিন্তু চাকরীর কলকাঠি যাদের হাতে তাদের সঙ্গে তার বেশ খানিকটা এক ধরণের বাধ্য বাধকতার সম্পর্ক আছে!

চোরাবাজারী মুনফার একটা যে অংশ ক্ষমতার পূজায় লাগে সেও তার ভাগ পায়।

নরেশের মত ললনার পিছনে প্রীতিসম্মেলনে আসরে বৈঠক বা সভায় ঘুরবার মত তার সময় নেই। সে একাই বাড়ীতে আসে।

এবং বেশ টের পাওয়া যায় যে তার পদার্পণ ঘটলে বাড়ীর সকলে একটু তটস্থ হয়ে ওঠে। একটু অস্বস্তি বোধ করে।

যতই অর্থ আর প্রতিপত্তি থাক, বয়স গিয়েছে পঞ্চাশের দিকে। ললনার সঙ্গে একেবারেই মানাবে না! তাছাড়া, বৌ করে কোন

মেয়েকে গলায় ঝুলোবার ইচ্ছা তার আছে কিনা সেটাও যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়।

তবে এটাও অবশ্য ঠিক যে বয়স হলে মানুষের মতিগতির যে বদলও হয় সংসারে অনেকবার তা দেখা গিয়াছে।

নইলে বিশেষ সভা সম্মেলনে বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসাবে ছাড়া কোথাও যাওয়ার সময় তার হয় না বটে কিন্তু নিজের বাড়ীতে আজকাল সে মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক বৈঠক বসায়!

এবং দেখা যায় এসব ক্ষেত্রে টাকা বা নিজেকে জাহির করার বড়বাজারী রুচির পরিচয় যে দিতে নেই এটা সে ভালরকম ভাবেই জানে। গরীব শিল্পী সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকদের সে মার্জিত ভাবেই সম্মান করে।

তবে একটু গা বাঁচিয়ে করে। কে জানে কে কবে কি অনুগ্রহ চাইতে আসবে এই পরিচয়ের সুযোগে।

আগেও ললনাকে সে দেখেছে কিন্তু চোখে লাগেনি। ললনার রূপটা যদি হ'ত মোহিনীর মত তাহলে হয় তো প্রথম দর্শনেই সে ঢের বেশী পাগল হয়ে উঠত।

ঘটনাচক্রে ললনার গান শুনে সে মুগ্ধ হয়ে গেছে।

কাব্যের ছোঁয়াচ লাগে সব মানুষেরই। প্রাণের গভীরতায় যা কিছু আলোড়ন তোলে যৌবনে হয় তো সেসব তার প্রাণেও সাড়া জাগাত।

হয়তো বিশেষ ভাবে গান শুনেই তার প্রাণটা ব্যাকুল হত বেশী।

সিনেমা জগতে রূপসী গায়িকার অবশ্য অভাব নেই। কারও রূপে আর গানে মুগ্ধ হলে সামাজিক ভাবে তাকে তোয়াজ করার দরকারও হয় না।

কিন্তু সে তো ব্যবসাদারী সস্তা গান। সে গান শুনে শুধু মজাই লাগে। অত কায়দা ললনা জানে না কিন্তু প্রাণ দিয়ে গান গেয়ে সে মানুষের প্রাণকে ব্যাকুল করতে পারে।

উদ্যোগী পুরুষ, ব্যস্ত মানুষ। ললনার হৃদয় জয় করতে তার একটু অশোভন তাড়াহুড়া দেখা যায়।

বোবা হাবা তো নয়। তার টাকা আর প্রভাব প্রতিপত্তিই যে আসল কথা এটা সে জানে। একজন সাধারণ তরুণ যে ধৈর্য্য আর অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রিয়ার বিমুখী মনটা নিজের দিকে ফেরাবার তপস্যা করবে সেভাবে অগ্রসর হয়ে তার কোন লাভ নেই।

ওভাবে কোন মেয়ের মন জয় করবার আশা সে রাখে না। মন তাকে কিনতেই হবে। তবে এই মনটা তো আর ঝনাৎ করে টাকা ফেলে কিম্বা সুযোগ সুবিধা বাগিয়ে দেবার কথা দিয়ে কেনা যাবে না।

একটু সামাজিক তোড়জোড়ও দরকার।

দিনে তিনচার বার ফোন করে। যখন তখন আসে। দু'চার মিনিট গল্প করে।

বলে, একটা গান শোনাও না ?

অন্য কেউ হলে ললনা হয় তো বলত, এখন তো গাইতে পারবনা।

কিন্তু বঙ্কিম শুনতে চাইলে অসময়েও গান শোনাতে হয়। বাপের দিকটা খেয়াল রাখতে হয় তাকে। বঙ্কিমের অনেক ক্ষমতা।

সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়। বঙ্কিম দুটো বিশেষ সম্মানজনক নিমন্ত্রণের পাশ পায়। সঙ্গে যাবার জন্য ললনাকে নিমন্ত্রণ জানায়।

মাঝে মধ্যে শুধু বন্ধুর সঙ্গে ছাড়া কারো সঙ্গে ললনা সিনেমায় যায় না। কিন্তু বঙ্কিমের কথা আলাদা।

মা বলে, তুই যে এভাবে সিনেমায় যাচ্ছিস, সবাই তো দেখছে ?

কেশবের সামনেই বলে। তৈরী হয়ে সে যখন গাড়ীতে উঠতে যাবে।

বঙ্কিম অবশ্য তার গাড়ী পাঠাতে চায়। ললনা বারণ করে।

মায়ের অনুযোগের জবাবে ললনা বলে, কি করব বল? বাবাকে বললাম, বাবা বললে সিনেমায় যেতে দোষ কি?

: আমায় তো একদিন নিয়ে যায় না! যার তার সঙ্গে তোর যেতে দোষ নেই, আমায় একদিন নিয়ে যেতে কি দোষ!

: যাবে আমার সঙ্গে? এসো না মা, লক্ষ্মী মেয়ে। ভারি উপকার হবে আমার!

: না বাছা। উনি কি ভেবে কি করছেন জানি নে। না বলে কয়ে হুট করে তোমার সঙ্গে যাই কি করে?

কেশব ভাবে, মাও ভয় করে বাড়ীর কর্তাকে! মেয়েও তোষামোদ করে বাপের মুরুব্বিকে! শুধু তার জগতের মা আর মেয়েরা যেরকম ভাবে করে এদের রকম সকমটা তার চেয়ে খানিকটা আলাদা।

শুধু ললনার জন্যই বঙ্কিম সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য নিজের বাড়ীতে মাসে দুটো তিনটে সাংস্কৃতিক বৈঠক ডাকছে, এটা মোটামুটি জানাজানি হয়ে গেছে সংশ্লিষ্ট মহলে। কিন্তু ললনাকে কেউ দোষ দেয় নি, তার নিন্দাও করেনি।

এই ভাবেই তো জগৎ চলে। ভদ্র অভদ্র কত গানজানা মেয়ে বঙ্কিমকে গান শুনিয়ে একটু খুসী করতে পারলে বর্তে যেত।

ওরা কেউ ধারে কাছে ঘেঁষতে পারত না বঙ্কিমের। কত ভাবে কত রকম চেষ্টা করেও তাকে টানা যায়নি।

ললনা যদি তাকে দিয়ে তার নিজের বাড়ীতে সকলকে ডেকে বৈঠক বসাবার ব্যবস্থা করে থাকতে পারে তাকে বাহাদুর মেয়ে বলতে হবে।

কেশব শুনছে কি শুনছে না কেয়ার না করে নরেশ বলে, তোমাকে দিয়ে কয়েকজন চালাক মানুষ নিজেদের কাজ বাগিয়ে নিতে চাইছে বুঝতে পারছ না? আসলে এরা বঙ্কিমের স্তাবক হতে চায়, তাই এভাবে

তোমার প্রশংসা করে। সত্যিকারের সংস্কৃতিচর্চ্চা যারা করে তারা কি ওর বাড়ি যায়? যে ক'জন তোমার খাতিরে যায়, তারা ওভাবে ওই লোকটার সামনে তোমার প্রশংসা করে? বোঝ না?

: বুঝি বৈকি। আমি সব বুঝি। আপনি যে একথাগুলি কেন বলবেন তার মানেও বুঝি।

: বলে দোষ করলাম?

: না! বলে প্রমাণ দিলেন যে আপনার বিদেশী বিগ্যাবুদ্ধি আপনাকে গ্রাস করেনি।

: বিগ্যাবুদ্ধির দেশ বিদেশ আছে নাকি?

: এটা যে জানে তার কাছে নেই। না জানলেই আছে!

বঙ্কিম সেদিন বিশেষভাবে ললনাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। তার বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় আসর বসবে, ললনার যাওয়া চাই।

: একটু দেরা হবে আমার। একটা কাজ সেরে যাব।

তা হোক। দেরী হলে আপত্তি নেই। কিন্তু ললনার যাওয়া চাই।

আসলে ললনার কাজ কিছুই ছিল না। আগে গেলে বেশীক্ষণ থাকতে হবে তাই দেরী করে যাওয়া।

সে অনিমেষকে বলে, তুমিও চলনা বাবা?

অনিমেষ বলে, না। আমার কাজ আছে।

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় ললনাকে নিয়ে কেশব বঙ্কিমের বাড়ীর সামনে পৌছায়। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় না ভিতরে অনেক লোকের আসর বসেছে। উপরের এক ঘরে রেডিও বাজছে শোনা যায়।

ললনা ভিতরে গিয়ে ফিরে আসে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে।

থমথম করছে মুখ, ঠোঁট ফুলে উঠেছে, চোখে বিদ্যুতের ঝলক।

কেশব মনে মনে বলে, অ!

ধার পদেই ললনা গাড়ীতে ওঠে, শান্ত ভাবেই বলে, বাড়ী চলুন।

অনিমেষ বাইরের ঘরেই ছিল। বাড়ীতে পা দিয়েই ললনা বলে, বাবা, এখুনি বঙ্কিমবাবুকে ফোন করে দাও তো আর যেন কখনো আমাদের বাড়ীতে না আসে।

ঃ কেন ?

ঃ ছল করে খালি বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আমায় অপমান করেছে। মুখে অপমান করলে তোমায় জানাতাম না। এমন অসভ্য মানুষ হয় ? চলে আসব, কিছুতে হাত ছাড়বে না, আমাকে শেষে হাতে কামড়ে দিতে হল।

একটু থেমে খানিকটা খুসীর স্বরে ললনা যোগ দেয়, একেবারে রক্ত বার করে নিয়েছি।

অনিমেষ নীরবে ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নেয়।

চার

সেদিন বাড়ী ফিরতে প্রণব খুব রাগের সঙ্গে অনুযোগ দিয়ে বলে, তুমি কি দাদা এমনি উদাসীন হয়ে থাকবে ? সংসারের দিকে একটু ফিরেও তাকাবে না ? ঝন্ঝাট পোয়াতে হবে আমাকেই ? বিয়ে করে আমিই ঝকমারি করেছি নাকি ?

এমনিতে প্রণব খুব শান্ত এবং নিরীহ। ছোটখাট রোগা মানুষটার চেহারায় একটু রুগ্ন রুগ্ন ভাব। পোষ্টাপিসে চাকরী করে।

আচার নিয়ম যা শিথিল হবার হয়ে গেছে। কিন্তু সে মাছ মাংস খায় না। নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা আহ্নিক করে।

কেশব বলে, হল কি ? আমাকে কি করতে বলছ ? আমি ভোরে বেরিয়ে এত রাতে বাড়ী ফিরি, সংসারের দিকে তাকাব কখন ? আসলে আমার তো ওখানেই থাকার কথা।

: তাই বলে কোন দায়িত্ব নেবে না সংসারের ?

: রাত্রে 'ওরা যদি আমায় ছুটি না দিতেন ? তোমরা ধরে নাও না কেন আমি বিদেশে চাকরী করতে গেছি ! লোকে কি চাকরী ফেলে সংসারের ঝনঝাট পোয়াতে আসে ?

: আসে না ? বিয়ে পৈতে রোগ ব্যারামে দরকার হলেও চাকরী নিয়ে পরে থাকে ?

কেশব শান্তভাবে বলে, সে হল আলাদা কথা। আমি ভাবলাম তুমি সংসারের খুঁটিনাটি দরকারের কথা বলছো !

প্রণব গোমড়া মুখে বলে, ছোটখাট ব্যাপারে তুমি তাকাবে না জানি। নিজের বোনের বিয়ের ব্যাপারে তো একটু নজর দিতে হয়। না সেটাও খুঁটিনাটি ব্যাপার তোমার কাছে ?

: মিনুর বিয়ে ? আমায় তো কিছুই বলিস নি তোরা। আজ আচমকা ঝগড়া সুরু করলি।

প্রণব একলা কোমর বাঁধে নি। দলবল নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিল।

বিধবা বোন সুমতি বলে, কোন বিষয়ে গা কর না, তোমায় বলতেই যে ভয় করে দাদা।

মা বলে, কি ধুমসো হয়েছে মেয়েটা, তোর চোখেও কি পড়ে না ? তোর বাপ বেঁচে থাকলে রাতে ঘুম হত না, মুখে অন্ন রুচত না।

পিসীর মেয়ে দুর্গা বলে, সত্যি, মামা বেঁচে নেই, তুমিই তো কর্তা সংসারের, তোমারি দায়িত্ব সব। একটা কেলেঙ্কারি হলে লোকে তোমাকেই ছি ছি করবে, বলবে অমুকের বোন এই করেছে।

অসহায়ের মতই চারিদিকে তাকাচ্ছিল কেশব। সে ভাবটা তার কেটে যায়। সে বুঝতে পারে গুরুতর কিছু একটা ঘটেছে, নইলে সবাই মিলে তাকে এভাবে আক্রমণ করতো না। ছেলেমেয়েগুলি পর্যন্ত ভিড়

করে এসে কিছু না বুঝেও ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রণবের বৌ আদরিণীর এই এতখানি ঘোমটা। ঘোমটা তারই জন্য—সে ভাসুর। বিয়ের দু'বছরের মধ্যে দু'টি ছেলে মেয়ে হয়েছে, অন্য সকলের কাছে । কমাবার অধিকার পেয়েছে কিন্তু ভাসুরের কথা আলাদা ঘাটে গিয়ে প্রায় উলঙ্গ হয়ে গা ধোয়, স্নান করে—চারিদিকে কত চোখ গ্রাহ্যও করে না।

কিন্তু ভাসুরের কাছে ঘোমটা টেনে জড়সড় হয়ে থাকা চাই।

সে একা নয়, আরও অনেক মেয়ে বৌয়ের মতই খোলা ঘাটে নির্ব্বিবাদে তিন হাতি গামছায় কাজ চালিয়ে ধরে দশহাত ঘোমটা টানে বলেই কেশবের গা জ্বালা করে না। আর পাঁচ জনের সমান তালে চললে তো দোষ দেওয়া যায় না মানুষকে।

মিনু ছাড়া বাড়ীর সকলে প্রায় ছেঁকে ধরেছে তাকে, বাচ্চা কাচ্চারা পর্য্যন্ত। জামা কাপড় ছেড়ে স্নান করে খোলা উঠানে জল চৌকিটা পেতে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে সে সবে ভাবতে সুরু করেছিল ডাল আর ডালনা দিয়ে রুটি খাবে না শুধু একটা ডিম সিদ্ধ করে দিতে বলবে।

হঠাৎ এই আক্রমণ।

বিড়িটা ছুড়ে ফেলে সে গম্ভীর আওয়াজে হুকুম দেয়, ভোলা আমায় একছিলিম তামাক দে।

তাঁর ভাবান্তর দেখে সকলে ভড়কে গিয়ে চুপ করে থাকে।

মস্ত উঠান। চারিদিকে ঘিরে আছে চুণবালি খসা ঘরগুলি। এই উঠানে চোদ্দ সালের যুদ্ধের পর চার বছর প্রতিমা এনে দুর্গা পূজা হয়েছিল, প্রতিমা আনা নেওয়ার জন্য দরজা ভেঙ্গে বসানো হয়েছিল কাঠের বড় গেট।

আজ সেই গেটের বদলে বসানো হয়েছে আলকাতরার পিপে কাটা টিনের তৈরী ঝাঁপ।

খড়ো ঘরের শরৎ যেমন একেবারে যুদ্ধে ফেঁপে গিয়ে দালান তুলে দোকান দিয়েছে, আগের যুদ্ধে তার বাবাও কিভাবে যেন কিছু টাকা বাগিয়েছিল।

ভোলা এসে বলে, তামাক যে শুকিয়ে খটখটে হয়ে আছে মামা?

ঘোমটার আড়াল থেকে আদরিণী ফিস ফিস করে বলে, আঃ মরণ, দু'ফোঁটা জল দিয়ে মাখাতে পারলি না? আয়, তামাক সেজে আনি।

প্রণব প্রশ্ন করে, ভাবছ কি?

ঃ ভাবছি, মিনুর বিয়ে কি তোমরা ঠিক করেছ? কি করেছ না করেছ আমায় বলবে তো?

ঃ আমরা করিনি কিছু। তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হবে, তাই বলছিলাম।

কেশব বলে, বুঝেছি, একটু ভাবতে দাও।

সর্ব্বাত্মক পারিবারিক আক্রমণের মানে সে এখন বুঝছে। এটা আক্রমণ নয়, এইভাবে তার শরণাপন্ন হওয়া। নিজেরা কি করবে বুঝে উঠতে পারছেনা, সাহস পাচ্ছে না নিজেদের দায়িত্বে কিছু করে বসতে, তাই তাকে চেপে ধরেছে মুস্কিল আসান করার জন্য।

তামাক টিকে হুঁকো কল্কি সবই বাড়ীতে থাকে কিন্তু কেশব তামাক খায় কদাচিৎ।

মিনিট দুয়ের মধ্যে নতুন জল ভরা হুঁকো হাতে ঘোমটার ফাঁক থেকে কল্কিতে ফুঁ দিতে দিতে আদরিণী এসে যায়। হুঁকোর মাথায় কল্কিটা বসিয়ে ভোলার হাতে দিয়ে চাপা গলায় বলে, হুঁকো হাতে দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করবি, বুঝলি?

প্রণব গর্ব্বের সঙ্গে বৌয়ের দিকে তাকায়।

কি যে ধীর স্থির বনে গেছে কেশব। কে বলবে তার দেহমনে অস্থিরতার পীড়ন চলে।

হুঁকোয় টান দেয়। একটু জল ফেলে ঠিক করে নিয়ে আবার টান দিয়ে একটু আরামের কাসি কাসে।

বলে, কি ব্যাপার হয়েছে আমি শুনতে চাই। মিনু কোথা গেল? মিনুকে ডেকে আনো।

প্রণব তাড়াতাড়ি বলে, না না, মিনুকে ডাকা ঠিক হবে না।

কেশব জোর দিয়ে হুকুমের সুরে বলে, মিনুকে ডাকতে হবে। বেচারা হয় তো কোন দোষ করেনি, তোমরা বানিয়ে বানিয়ে ওকে মিথ্যে দোষী করেছ। আগে মিনু আসবে, তারপর আমি তোমাদের কথা শুনব।

মিনুকে ডাকতে হয় না, সে নিজেই এগিয়ে আসে। উঠানের এক কোণায় একটা গোলাকার থাম দাঁড়িয়ে আছে। একক এই থামটি কি উদ্দেশ্যে গাঁথা হয়েছিল কেউ জানে না।

হয়ত বৃহৎ কোন পরিকল্পনা ছিল। থামটা অর্দ্ধেক গেঁথেই সা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

থামের আড়ালে বসে মিনু অতক্ষণ শুনছিল সকলের কথাবার্ত্তা। কেশবের কথা শুনে সে থামের আড়াল ঘুচিয়ে ধীর পদে এসে কেশবের পায়ের কাছে বসে।

: আমায় ডাকছিলে দাদা?

: হ্যাঁ ডেকেছি।

ধুমসো মেয়ে?

মিনু সত্যই বেড়েছে দুর্ভিক্ষের দেশের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে।

অথবা দুর্ভিক্ষের দেশেই এটা ঘটে? আবোল তাবোল খেয়ে খিদের জ্বালা মেটাবার ফলে গড়ন বাড়নেও প্রক্রিয়াটা অস্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার ফলে?

নিরীহ প্রণব হঠাৎ ঝেঁঝে বলে, তুমি তবে ওর কথাই শুনবে?

হুঁকোয় টান দিয়ে কেশব বলে, মোটেই না। তোমরা তো কথাই বলছ না, খালি প্যান প্যান করছ। এতক্ষণে বলতে পারলে না ব্যাপারটা কি হয়েছে। ওর কাছেই তবে শুনি।

: বললাম তো ওর বিয়ের ব্যবস্থা করা চাই।

: ও কি করেছে জানতে চাই আমি।

মা বলে, তবে আর কাজ কি কথায়, চ' যাইগে আমরা।

বাপ বহুদিন স্বর্গে গেছে, বিশেষ মুহূর্ত্তে সে যেমন করত তেমনিভাবে হুঁকোটা আছড়ে ফেলে কেশব বলে, মিনু কি করেছে না করেছে বলে তবে যাবে। পষ্টাপষ্টি সব না বলে তোমরা যদি যাও, এ মাসের মধ্যে জলের দরে আমি বাড়ী বেচে দেব। আমার থাকার ভাবনা নেই।

: তোমার একার নাকি বাড়ী?

: আমি বেচতে পারি—তুমি অর্দ্ধেক টাকা পাবে।

ঘোমটা ফাঁক করে আদরিণী ফিসফিস করে বলে, কি যন্তনা, এত কথা না বাড়িয়ে জানিয়ে দিলেই ফুরিয়ে যায়। তোমরা তো আর দোষ করনি।

মা বলে, মারধোর করিস নে যেন শুনে। আমার হয়েছে সব দিকে জ্বালা।

সুমতি বলে, মেয়ে করেছে কি শুনবে? দুপুর বেলা বেরিয়ে গেছে কাউকে কিছু না বলে। সন্ধ্যাবেলা ফিরেছে। কোথা গিয়েছিলি? না, বেড়াতে গিয়েছিলাম, বেশ করেছি, রোজ যাব। উল্টো চোপা আমাদের ওপর।

মিন্থু নিজে থেকে বলে, বেড়াতেই তো গিয়েছিলাম। জমিয়ে জমিয়ে দেড় টাকা করেছি, চাদ্দিক একটু ঘুরে দেখে এলাম। তোমরা খালি বলবে, কার সাথে গিয়েছিলি, কোথা গিয়েছিলি।

কেশব বলে, বলে গেলি না কেন?

: হুঁ, কত যেতে দিত বললে।

: তোমার একলা যাওয়া উচিত হয়নি।

: কেন বকুল যায় না?

এ একটা মোক্ষম যুক্তি বটে মিন্থুর। এই সেদিন পর্য্যন্ত বিপিনদের সঙ্গে অবস্থা চালচলন সব দিক দিয়ে তারা সমান ছিল, গলায় গলায় ভাব ছিল, আবার কথায় কথায় কলহ বিবাদ ছিল ছ'পুরুষের প্রতিবেশী পরিবার ছ'টির মধ্যে। এমন কি বাড়ী ছ'টি পর্য্যন্ত গাঁথা হয়েছিল এক ধাঁচে। তফাৎ যেটুকু ছিল সেটুকু আগে গণনার মধ্যেও আসে নি। সেটা হল একজন বিশেষ মানুষের সঙ্গে কি এক সূত্রে বিপিনদের একটু আত্মীয়তা থাকা এবং এরকম কোন মানুষের সঙ্গে কেশবদের কোনরকম সম্পর্ক না থাকা।

ওই মানুষটা মন্ত্রী হবার পর তফাৎটা খুব বড় হয়ে উঠেছে।

ভেঙ্গে চুরে নতুন রকম হয়েছে বাড়ীটার চেহারা, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড একটা গাড়ী কেনা হয়েছে, একেবারে বদলে গেছে বাড়ীর সকলের চালচলন।

তাদের মত প্রায় পাড়াটুকুর মধ্যেই ছিল সমস্ত পরিবারটি দিবারাত্রির জীবনযাত্রা, পুরুষেরা শুধু সহরে যেত পয়সার ধান্ধায়।

ভাসা ভাসা ভাবে ছাড়া আজকাল ওদের যেন সময়ই হয় না পাড়ার লোকের সঙ্গে মেলামেশায়—এবাড়ীর সঙ্গেও নয়। মেলামেশা চেনা

পরিচয়ের নতুন ছড়ানো জগৎ তৈরী হয়ে গেছে। বড়লোক মেয়েপুরুষ কত মানুষ আসে যায়, এ বাড়ীর মেয়েরাও পাল্টা দেখা সাক্ষাতের পাট বজায় রাখতে সর্ব্বদাই বেরোয়।

সেই প্রয়োজনে একেবারে বদল হয়ে গেছে তাদের অভ্যস্ত ঘরকন্নার পালা।

প্রণব বলে, ওদের কথা আলাদা। ওদের অবস্থার সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় যে বকুলের কথা বলছিস ?

সুমতি বলে, যাদের যেমন চালচলন। বকুল যা করে মানায়, বাড়ীর সবার চালচলনের সঙ্গে খাপ খায়। তুই হ'লি গরীব গেরস্ত ঘরের মেয়ে—

: বাইরে বেরোতে হলে বড়লোক হতে হয় নাকি ? গরীবের মেয়েরা বেরোয় না ?

মিনুর মন্তব্যে সুমতি চটে বলে, সে তারা বেরোয় যাদের অভ্যাস আছে, সেরকম শিক্ষা আছে। তুই তো বেরিয়েছিলি বজ্জাতি করতে।

মিনু সোজাসুজি কেশবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, ঘোষেদের জমিতে ওই যে হোগলার চালা তুলেছিল, ঘর ভেঙ্গে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে। সকাল থেকে আমগাছের তলায় বসেছিল। বৌটির সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। দুপুর বেলা ওরা চলে গেল, কোথায় যায় দেখতে সঙ্গে গিয়েছিলাম।

ফিসফিসানি বজায় রেখেও গলা চড়িয়ে আদরিণী বলে, মিছে কথা বলছ কেন ঠাকুরঝি ? ওবাড়ীর শচীনের সঙ্গে তুমি ফিরেছ, সবাই দেখেছে।

মিনু কিছুমাত্র দমে না গিয়ে বলে, ফিরেছিই তো, সবাই দেখেছেই তো। রিক্সা করে আসছিল, আমায় হাঁটতে দেখে রিক্সায় তুলে

এনেছে। বজ্জাতি করতে গেলে কি সবাইকে দেখিয়ে ওর সাথে ফিরতাম? কেউ টেরও পেতে না তা'হলে। তোমাদের বাঁকা মন খারাপটা ছাড়া তোমরা ভাবতে পার না।

একটু থেমে মিনু আবার বলে, ওই তো ওরা ঘুরে ঘুরে কোথাও ঠাঁই পেল না, শেষকালে ষ্টেশনে গিয়ে উঠল। কাল আবার ঠাঁই খুঁজতে বেরোবে। গেরস্ত ঘরের কত মেয়ে বৌ ভিক্ষে করছে দেখে এলাম। আমি আর ভয় করিনে তোমাদের। তাড়িয়ে দিলে দেবে, ভিক্ষে করে গতর খাটিয়ে খাব। যে সুখেই রেখেছে!

মিনুর শেষ কথাটা কানে যেন বিঁধে যায় কেশবের।

মায়াও একদিন বলেছিল, কি সুখেই রেখেছে! এত লোকের সংসার, এতগুলি বাচ্চা কাচ্চা, একটা ঝি পর্য্যন্ত রাখেনা। খাটতে খাটতে হাড় কালি হয়ে গেল।

তবু মায়ার কেন এত দরদ সবার জন্য, এমন শান্ত মধুর ব্যবহার? তার কাছে যাই বলুক, মিনুর মত মুখ খুলে একটু নালিশ কেন সে জানাতে পারেনা? তার স্নেহ মমতায় ফাঁকি নেই। কিন্তু স্নেহমমতা একটু কম করলে কি আসত যেত?

মিনুকে নিয়ে আলোচনা সে রাত্রে সেখানেই শেষ হয়। কেশবকে দু'একদিন ভেবেচিন্তে দেখতে হবে, সে সকলকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে মিনুর কাণ্ড নিয়ে কেউ যেন আর হৈ চৈ না করে। মিনুও যেন এরকম না বলে কয়ে বাড়ী ছেড়ে না যায়।

: পয়সা নেই, আর যাব কি করে? দু'চারটে পয়সা জমলে তবে তো।

মিনুর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। ছেলে খুঁজে বিয়ে

দিয়ে দিতে হবে। মিনুও তাই চায়। আর সমস্ত বিষয়ে চলবে এক রকম নিয়ম, শুধু তার বিয়ের বেলা হবে নিয়ম ভঙ্গ, এত বড় ধেড়ে মেয়ে সে কুমারী হয়ে থাকবে। লোকে যা তা ভাববে, যা তা বলবে। এটা সইছে না মিনুর।

তার কাছে লজ্জাকর গ্লানিকর হয়ে উঠেছে এই অনিয়ম।

বিছানায় শুয়ে কেশব মায়ার দরদের মানেটা বুঝবার চেষ্টা করে। সংসার অন্যের, তাকে খাটাচ্ছে দাসীর মত। তবু সেই সংসারের সকলের জন্য তার বুক ভরা স্নেহ কেন? এতটা নরম না হয়ে একটু শক্ত হলে, প্রাণ দিয়ে এত বেশী খাটতে অস্বীকার করলে যে অন্যায় অবিচার খানিকটা কম হয়, এটাও কি জানা নেই মায়ার?

তাকে ছাড়া চলবে না গোবিন্দের সংসার। জোরের সঙ্গে বললে একটা ঝিয়ের ব্যবস্থা না করে দিয়ে সে যাবে কোথায়?

তবু মায়া নালিশ করে না, বিরক্ত হয় না, মুখ বুজে খাটে আর স্নেহ করে।

এটাই তার স্বভাব বলে? যে যন্ত্রের যে কাজ, যে যন্ত্রকে যেমন তাই করতে হয়। তেমান স্নেহ না করে পারে না বলেই মায়া স্নেহ করে?

আজ একটু খটকা লেগেছে কেশবের মনে।

এও তো হতে পারে যে নিজের প্রয়োজনেই সবার জন্য মায়ার স্নেহ? সংসারের ভার নিয়ে বাচ্চা কাচ্চা রুগ্না জা'-এর দায়িত্ব নিয়ে খাটতে তাকে হবেই। পর যদি সে ভাবে সকলকে, মমতা যদি তার না থাকে সবার জন্য, সে দায়িত্ব হয়ে উঠবে নীরস বোঝা বওয়া, খাটুনি হয়ে দাঁড়াবে দাসীর কষ্টকর খেটে মরা।

যাদের জন্য বুক ভরা দরদ তাদের জন্য খেটে মরার সুখ আর গর্ববোধটা জুটবেনা।

তার জন্য মায়ার সীমাহীন ব্যাকুল ভালবাসার মানেও কি তবে তাই ?

এরকম দেহ মন প্রাণ দিয়ে ভাল না বাসলে তাদের সম্পর্কটা হয়ে যাবে অন্যায়, একটা পাপ ?

সংসারের সাধারণ নিয়মে সাধারণ হিসাবে তাদের ঘনিষ্ঠতা অনুচিত বলেই এমন অসাধারণ প্রেম মায়ার দরকার হয়েছে ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিতের উর্দ্ধে উঠে সে হিসাবটা বাতিল করার জন্য ?

তার জন্য অনন্তকাল নরক ভোগের প্রশ্নটাকে তুচ্ছ করে দেবার জন্য ?

পাঁচ

কানু মিস্ত্রীর বিয়ে ভেস্তে গেছে।

ভেস্তে দিয়েছে সে নিজে।

কেন, সংসার করার ইচ্ছা নেই তার ?

ঃ আছে না ? কিন্তু মনটা বড় বিগড়ে গেল। একটা ছুঁড়িকে পছন্দ করে এত সহজে হার মানব ? ক'দিন ধরে কি ছটফটানি গেছে কি বলব মাইরি তোকে। মুখে ভাত রোচে না, রাতে ঘুম হয় না, ভিতরটা জ্বালা পোড়া করে।

কেশব হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কানু বলে যায়, কেবলি মনে হয় ভারি অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছি। মানুষের বাচ্চার তো এটা উচিত নয়। যা চাইব, না পেলে অমনি হাত গুটিয়ে নেব, যেমন তেমন একটা পেলেই খুসী থাকব, তবে আর বাঁচা কেন ? চেষ্টা তো করে দেখতে হয় ! ওর বাপটাকে শুধু মাঝে মাঝে বলেছি, বাস। জবরদস্ত চেষ্টা তো করিনি।

মস্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কানু।

: হয় হবে, না হয় না হবে, আমি তো বেঁচেছি বাবা মনটা ঠিক করে। রাতে ঘুম হচ্ছে আবার।

কেশব জিজ্ঞাসা করে, ভাব আছে তোদের?

: ভাব? পিরীত? ওসব আমার আসেনা ভাই। কাটখোট্টা মিস্তিরি, খাটি, ওসব রস পাব কোথা? মাঝে মধ্যে মার কাছে আসে, দেখা হয়, দুটো কথা হয়, বাস!

কানু একটু হেসে মাথা দুলিয়ে যোগ দেয়, তবে বেলা জানে ওকে আমার খুব পছন্দ।

: মা কি বলল?

: মা চটে মটে মামার কাছে চলে গেছে। দু'দিন বাদে রাগ পড়লে আবার আসবে।

কানু একবার উঠে পড়ে লাগবে, প্রাণপণে চেষ্টা করে দেখবে বেলাকে নিয়েই যদি সংসার করার সাধটা মেটানো যায়।

সে যদি জানতো কি করলে তার অসুখটা সারানো যায়! সেও একবার উঠে পড়ে লাগত, জীবন পণ করে চেষ্টা করে দেখত।

ললনার চিকিৎসা করে অজয়। ডাক্তার রোগের আক্রমণ ঘ'টে ললনা বিছানা নিলে তখন সে তাকে দেখে এসেছে বরাবর, কখনো তার গান শোনে নি।

ঘটনাচক্রে অনিমেষের এক বন্ধুর বাড়ীতে কান দিয়ে তার গান শুনে এবং চোখ দিয়ে তাকে গাইতে দেখে সে একটা বড় ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা দিয়েছে।

কিছু কাল ললনাকে গান গাওয়া একেবারে বন্ধ রাখতে হবে।

গান গাইতে ফুসফুসে চাপ পড়ে বলে নয়, গান সে বড় বেশী মন দিয়ে বড় বেশী আবেগের সঙ্গে গায় বলে। হাঁপানি নাকি এক হিসাবে বড়ই

বেখাপ্পা রোগ। চেঞ্জে গিয়ে অনেক রোগ তো সারেই, এক যায়গাতে শুধু বাড়ী বদল করেই নাকি কারো কারো অসুখ ভাল হয়ে যেতে দেখা গেছে।

গান বন্ধ থাক। ললনার স্নায়ুমণ্ডলী বিশ্রাম পাক। দেখা যাক কি ফল হয়।

আর খুব বেড়াক। সহর থেকে দূরে গিয়ে রোজ গাঁয়ের হাওয়া খেয়ে আসুক।

উৎসব বৈঠক সভাসমিতি আর এত বেশী লোকের সঙ্গে মেলা মেশার চাপ থেকেও তার স্নায়ুমণ্ডলী রেহাই পাক।

: আপনি যে উল্টো কথা বলছেন ডাক্তারবাবু? দশজনের সঙ্গে মিলেমিশেই যে আমার মনটা ভাল থাকে?

: নইলে মনটা খারাপ থাকে তো? মনটা যাতে কিছুতেই খারাপ না হয় চেষ্টা করে দেখা যাক। এমনিতে মনটা ভাল থাকলে দশজনের সঙ্গে মিশতে আরও ভাল লাগবে।

ললনা তবু খুঁত খুঁত করে, গান বন্ধ, মেলামেশা বন্ধ—

অনিমেষ বলে, কয়েক মাসের ব্যাপার তো। অসুখটা যদি সেরেই যায়?

তাই হোক, আরোগ্যের আশায় দেখাই যাক একটা কঠিন পরীক্ষা করে।

ললনাকে গান শেখায় ভূদেব।

সে শুনে বলে আর একটা নতুন গান তোমায় শিখতে হবে, গাইতে হবে। তারপর তুমি ছুটি নিও। বেশ কিছুদিন ধরে পরীক্ষা করেছি সুরটা নিয়ে। বিদেশী সুর কতখানি খাঁটি রেখে কত কম দেশী সুর মিশিয়ে দিলে লোকে নিতে পারে?

: সত্যি ? নিশ্চয় শিখব। এটা না শিখে কখনো গান বন্ধ করতে পারি ?

কেশবের কাজ বাড়ে। ললনাকে রোজ গাঁয়ের দিকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া।

তবে কিছুদিন থেকে মাইনেটা সে বাড়িয়ে নেবার কথা ভাবছিল। এই সুযোগে সেটা আদায় করে নেয়।

তার বাড়ীর দিকের রাস্তা দিয়েও গাঁয়ে যাওয়া যায়। বোসপাড়া ছাড়িয়ে এগোতে থাকলে তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যেতে থাকে সহরতলীর শেষ চিহ্নগুলি, পাওয়া যায় ক্ষেত মাঠ বাঁশ ঝাড় কাঁচা ঘরের খাঁটি গ্রাম।

এদিকে কলকারখানা এক রকম নেই বলা চলে। রাস্তাটা খুব খারাপ। সহরের যেসব দিকে শিল্প গড়ে উঠেছে অনেক বেশী দূর এগিয়ে গেলেও সে সব দিকে সহরতলীর লক্ষণবিহীন গাঁ যেন চোখেই পড়তে চায় না।

সে দিন ললনাকে বোসপাড়া পেরিয়ে গাঁয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, একটু ফাঁকা যায়গায় পথের ধারে একটা শিরীষ গাছের তলায় দাঁড় করানো গাড়ীতে সে দেখতে পায় কানু আর বেলাকে।

পাশাপাশি বসে কথায় দুজনে একেবারে মশগুল!

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সেও গাড়ী দাঁড় করায়।

ললনা নামতে নামতে বলে, আপনার বাড়ী এইখানে নাকি ? এতদুর ?

আটদশ দিন গান ও ছুটোছুটি বন্ধ রাখায় ললনার মুখের চেহারা গলার আওয়াজ বদলে গেছে।

: একদিন যাব আপনাদের বাড়ী। আপনি রোজ কেন বাড়ী ফেরেন দেখে আসব। হঠাৎ গেলে বাড়ীর মেয়েরা মুস্কিলে পড়বেন নইলে আজকেই যেতাম।

ললনার কৌতূহলটা যে কত প্রচণ্ড কেশব তা টের পায়। কিন্তু মাইনে করা ড্রাইভারের কাছে কৌতূহলটা একটু চেপেই রাখতে হয়। সিনেমায় বড়লোক অভিজাত ঘরের মেয়ে এভাবে একা ড্রাইভারের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে বেড়াতে গেলেই তার প্রেমে হাবুডুবু খায়। কিন্তু বাস্তব জগতের মেয়েরা অত বোকাও নয়, সস্তাও নয়।

মাইনে করা ড্রাইভারও মানুষ। তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা, ভদ্রঘরের ছেলে বলে তাকে আপনি বলা এক জিনিষ। মানুষ বলেই তার প্রেমে পড়তে হলে বড় বিপদের কথা হয়!

তবে মাইনে করা ড্রাইভার যদি মহাপুরুষ হয় সেটা আলাদা কথা। মোটর গাড়ীর মালিকের মেয়েকে প্রেমের টানে পাগলিনী করার জন্য ক'জন মহামানুষ মানুষকে এগিয়ে নেবার গুরু দায়িত্ব আর কর্ত্তব্য বাতিল করে মাইনে করা ড্রাইভার হয়েছে সেটা অবশ্য গবেষণার ব্যাপার।

খেয়াল? নতুনত্বের পিপাসা? বিকার? একটা মোটর গাড়ীর মালিকের মেয়ে হয়েও ওই ঘরবাড়ীর মত নিজেকে পুরুষের সম্পত্তি বলে জানার ফলে দিশেহারা হয়ে প্রতিহিংসা নেওয়া?

স্বাধীনতার সুগার কোটিং করা দাসীপনায় তিক্ত জীবনে মুক্তি খোঁজার সন্ত্রাসবাদ?

কিন্তু তাকে প্রেম বলা কেন! প্রেম তো বিকার নয়, খেয়াল নয়, স্বার্থপরতা নয়।

শুধু নারীপুরুষেই তো প্রেম হয় না! মানুষের জাতটাকে বাদ দিয়ে কোথায় তারা প্রেম করবে?

শুধু রাধা শুধু কৃষ্ণের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রেম হয় না। তাদের প্রেমকে রূপ দেয় নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের প্রেমের গৎ। কত কবি হাজার হাজার বছর ধরে আঁকড়ে ধরেছে শুধু নায়ককে আর নায়িকাকে,

সার করেছে তাদের প্রেমটুকুকে—তবু মানুষের প্রেমের জগতকে বাদ দিতে পারে নি। চুরি করে এনে চুপিচুপি রঙ চড়িয়ে ওই জগতের মাল মসলা দিয়ে তাকে গাঁথতে হয়েছে ছাঁকা প্রেমের বাঁকা দালান।

ললনা কি এসব ভাবে? ভাবে বৈ কি। স্পষ্টই সে অনুভব করে জীবনকে সুন্দর করার অজুহাতে বাস্তব জগৎ ও জীবন থেকে কত কৃত্রিমতার আড়াল তৈরী করে তবেই তার ভদ্র আর মার্জ্জিত জীবন সম্ভব হয়েছে। কি মূল্য তাদের দিতে হয় এজন্য সে টের পেতে আরম্ভ করেছে আজকাল।

ছাঁকা মনুষ্যত্বকে ভালবাসার ফাঁকি অভ্যাস হয়ে যাওয়ায় মানুষকে ভালবাসতে পারেনা।

সূর্য্য পশ্চিমে হেলেছে। গুমোটে গাছের পাতাটি নড়ে না। পথে লোক চলাচল বেড়ে গেছে। কুড়ি বাইশজন নানা বয়সের চাষী মেয়ে বৌ দল বেঁধে এসে মাঠে নেমে কোনাকুনি গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যায়। তাদের রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ, পরনে ছেঁড়া মলিন কাপড়।

হয় তো পেটের জন্য খাটতে গিয়েছিল নয় তো কাজ অথবা খাদ্যের সন্ধানে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরছে।

জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল না কেন?

চাষী মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ললনা হঠাৎ বলে, আমি একটু গ্রাম থেকে ঘুরে আসছি।

: একা যাবেন?

: কি হবে একা গেলে?

: গাড়ী আর আপনাকে সেফ্‌লি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায় আমার। কোন বিপদ হলে আপনার বাবা আমাকে পুলিশে দেবেন।

: গ্রামে আবার বিপদ কি?

ললনা মাঠে নেমে যায়।

মাঠটুকু পেরিয়ে ললনা গাছপালা ঘরবাড়ীর আড়ালে চলে গেছে, কান্থর গাড়ীটা কাছে এসে থামে।

বেলা সলজ্জ ভাবে হেসে বলে, আপনি যে এখানে কেশবদা?

: বাবুর মেয়ে বেড়াতে এসেছেন।

কান্থ বলে, আমিও আরেক বাবুর মেয়েকে বেড়াতে এনেছি।

: গাড়ী কার?

: কারখানার গাড়ী। মেরামতের পর টেষ্ট করতে বেরিয়েছি একটা ভাঁওতা দিয়েছি. দশ বার মাইল খুব স্পীডে চালিয়ে দেখতে হবে।

কেশব সংশয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, বাড়ী থেকে বেলাকে আসতে দিল?

কান্থ হাসে।—তাই কি দেয়? আগে বলা ছিল, রাস্তায় গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করব।

বেলা অন্থযোগ দিয়ে বলে, একটু গাড়ী চড়াবার জন্যে আধ মাইল হাঁটিয়েছে—ফিরবার সময় আবার হাঁটতে হবে।

কান্থ বলে, আমার দোষ নাকি? তোমারি তো ভয়, পাড়ার কাছে হলে চেনা লোক দেখতে পাবে। আমি তো বলছি দেখতে পাক না চেনা লোক—ভালই হবে। বাড়ীতে নয় বকাবকি করবে—গায়ে তো ফোস্কা পড়বে না? টের তো পাবে যে কান্থ মিস্ত্রি ছাড়া মেয়ের গতি নেই।

মিন্থর বাড়টা অস্বাভাবিক, বেলা খুব রোগা। মুখের ছাঁচ তেমন স্থশ্রী নয়, কিন্তু দেখেই টের পাওয়া যায় খুব চালাকচতুর মেয়ে।

বেলাও বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছে বাড়ীতে কিছু না জানিয়ে, সেদিন মিন্থও বেরিয়েছিল। কত তফাত দু'জনের অকাজের রকমে!

মিন্থ বেরিয়েছিল ভাবাবেগের তাড়নায়, মরিয়া হয়ে। জানুক সবাই বুঝুক সবাই যে তাকে আর তুচ্ছ করা চলবে না। একটি ছেলের খোঁজ মিলেছে, কথাবার্ত্তা চলছে। তাতেই মিন্থকে শান্ত আর সুখী দেখাচ্ছে আশ্চর্য্য রকম।

বেলা বেরিয়েছে হিসাব করে সাবধান হয়ে। কেউ যাতে জানতে না পারে, গণ্ডগোল না হয়। কেশব জানে তারও এটা সখের বেড়ানো নয়, কান্থর সঙ্গে মোটর বিহারটাই আসল কথা নয়।

দু'জনের মশগুল হয়ে কথা বলার ধরনটা একনজর দেখেই সে এটা টের পেয়েছিল।

পাশে এসে পড়লে তবেই তার গাড়ীর আওয়াজটা ওদের কানে গিয়েছিল, মুখ তুলে তাকিয়েছিল।

এমনি সুযোগ সুবিধা নেই, ওরা তাই একটু পরামর্শ করতে বেরিয়েছে। বুদ্ধিটা কান্থর হতে পারে কিন্তু বেলার কাছেও পরামর্শটাই আসল কথা।

কান্থর গাড়ী ফিরে যায়। কেশব একটু ঈর্ষা বোধ করে। কান্থর যেমন কোন বিষয়ে দোমনা ভাব নেই, মনটা একবার ঠিক করে নিতে পারলেই হল—বেলারও তেমনি কোন বিষয়ে ন্যাকামি নেই হাবামি নেই।

যদি বিয়ে হয় দু'জনে মিলবে ভাল।

একটা বিড়ি ধরিয়ে কেশব ভাবে, গরীব সংসারে দুঃখ কষ্ট পেয়ে বেলাও বড় হয়েছে, মিন্থও বড় হয়েছে, বিদ্যাও প্রায় একইরকম দুজনের পেটে, কিসে এতখানি তফাত হল দুজনের প্রকৃতিতে? কান্থর সঙ্গে তার পার্থক্যের মানে আছে। সে রোগী, কান্থ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ।

কিন্তু বেলা আর মিনু কেন দু'রকম হল ?

কারণটা কি বংশগত ? শুধু রক্তের তফাতের জন্ত ? কিন্তু বেলার বাবা অজিতদের চেয়ে তাদের বংশই তো উঁচু।

অথবা কারণটা এই যে অনেকটা ভাল অবস্থা থেকে তারা নীচে পড়েছে কিন্তু অজিতদের চিরদিনিই সমান দুরবস্থা ? যেমনি হোক ঠাকুর্দ্দার আমলের একটা বাড়ী আজও তাদের আছে কিন্তু অজিতরা চিরদিন পরের ঘরের ভাড়াটে। কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে তাদের বাড়ীর মানুষের চেয়ে অজিতের পরিবারটির সম্পর্ক অনেক বেশী ঘনিষ্ট।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ললনা ফিরে আসে।

বলে, কলেরা বসন্ত লেগেছে খুব। রক্ষাকালীর পূজো হবে, চাঁদা চেয়ে নিল। রোগ ব্যারামের এমন ছড়াছড়ি বোধ হয় জগতে কোথাও নেই।

এবার যেন কাটতেই চায় না অসুস্থ অবস্থাটা। এবার তো তার কয়েকদিনের জন্ত একটু ভাল থাকার পালা।

অসুখটা কি বেড়ে গেল ? আরও দীর্ঘ হল কষ্ট ভোগের সময় ?

তবে একটা সান্ত্বনা এই যে এবার যেন লক্ষণগুলির উগ্রতা খানিকটা কম। আগের চেয়ে দু'এক ঘণ্টা বেশী ঘুম হচ্ছে, কিছু খেতেও পারছে।

আগের আগের বারের মত শ্রান্ত দুর্ব্বল হয়ে যায় নি শরীরটা, ভোঁতা হয়ে যায় নি চিন্তা আর অনুভূতি।

মায়ার উপরে পর্য্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। এবার মায়ার জন্তে ব্যাকুলতা কমে গেলেও বিরাগের ভাবটা আসে নি।

তার গাড়ী চালানো বন্ধ করতে কয়েকদিন মায়া পাগল হয়ে উঠেছিল, কি কারণে হঠাৎ চুপ করে গেছে। বোধ হয় টের পেয়েছে যে এই অসম্ভব আব্দার করে লাভ নেই।

তার বদলে সে ধরেছে অন্ত আব্দার।

: তোমার চেহারা দেখলে কান্না পায়। ঠিকমত সেবা যত্ন হচ্ছে না তোমার।

: কি করা যায়!

: একটা ঘর ভাড়া নাও। তুমি আমি থাকব।

: তাতে আর লাভ কি হবে বল? সকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত বাইরেই কাটবে।

অন্ধকারে মায়ার মুখ দেখা যায় না। তার মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে সে বলে, দ্যাখো অ্যাদ্দিন বলি নি তোমায়। আমার জন্যেই আরও তোমার শরীর খারাপ হচ্ছে। কখন সবাই ঘুমোবে, কখন আমি তোমায় ডাকব, এর একটা উৎকণ্ঠা আছে তো? এরকম চোরের মত আসা যাওয়ারও তো একটা উদ্বেগ আছে? কোথায় সকাল সকাল ঘুমোবে, আমার জন্যই তোমার রাত জাগতে হয়।

: রাত এমনিও জাগতে হয়। ঘুম এলে তো ঘুমোব?

: আমি তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দেব। সেইজন্যই তো বলছি কোথাও গিয়ে বাসা বাঁধি চল। ঘুম যদি তোমার নাও আসে, এখন একলাটি জেগে ছটফট কর, আমি থাকলে কথাবার্ত্তা কইলে অত কষ্ট হবে না।

: একটা কেলেঙ্কারি হবে যে?

: হোক কেলেঙ্কারি।

কেশব ভেবেচিন্তে বলে, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

একটু পরেই খটকা লাগায় হাত বাড়িয়ে টের পায় মায়ার চোখে জল ঝরছে।

মায়া ভিজে গলায় বলে, আমি বুঝেছি সব। আসলে আমাকে তোমার দরকার নেই, তুমি চাওনা আমাকে। রাতে ঘুম আসে না তাই একটু মজা করে যাও।

কেশব তাকে আদর করে বলে, তুমি ভুল বুঝেছ। ভেবে দেখি মানে আমি অন্য উপায়ের কথা ভাবছি।

: সত্যি ? ছাখো, গায়ে আমার কাঁটা দিয়েছে। কি উপায় বল না ?

: আগে ভাবি, তারপর বলব। মাথাটা ভোঁতা হয়ে আছে।

: ইস্। আমি মরলে তোমার অসুখটা যদি সারত !

শুনে কেশবের রোমাঞ্চ হয় না বটে কিন্তু সে বিশ্বাস করে মায়ার এসব মন ভুলানো বানানো কথা নয়। সমস্ত দায় আর ঝঞ্চাট এড়িয়ে তার সঙ্গে নিরালা একটি নীড়ে প্রকাশ্যভাবে নিশ্চিন্ত মনে বাস করার আশাতেই হয় তো সে এভাবে এসব কথা বলে। তাকে উস্কিয়ে দিতে চায় যে গভীর রাতে এভাবে চোরের মত কিছুক্ষণের জন্য তাকে পাওয়ার বদলে ব্যবস্থা করলেই চব্বিশ ঘণ্টা সে তাকে আপন করে পেতে পারে—এজন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কলঙ্কও সে বরণ করতে রাজী আছে। কিন্তু এতো ছলনা চাতুরীর কথা নয়। সে নিজেরও সুখ আর সার্থকতা চায়—সেটা কি অপরাধ মানুষের ? নিজেকে সে তো বিনা সর্ত্তে সঁপে দিতে চায় নিন্দা কলঙ্ক তুচ্ছ করে, সমাজ আর আইনের স্বীকৃতি না পেয়েও তার সঙ্গে নিজস্ব একটি নীড় বাঁধার আশায়।

সন্তান সে চাইবে না। সে জানে এ জীবনে সন্তান শুধু তার বিড়ম্বনাই হবে।

এতদিনের অভ্যস্ত সামাজিক জীবনও সে চাইবে না। কয়েক দিন আগেও গোবিন্দের ভাই-এর মেয়ের বিয়েতে তাকে সাদরে সমাদরের সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। সে খুব খাটতে পারে, কাজে কর্ম্মে তাকে বিশেষ ভাবে দরকার হয়।

যাওয়ার আগে মায়া বলে গিয়েছিল, যাচ্ছি, কিন্তু মনটা আমার পড়ে রইল এইখানে। চেষ্টা করে কৌশলে তোমায় একটা নেমন্তন্ন দেয়াবো। যেও কিন্তু তুমি।

মায়া কি আর জানে না ঘর ছাড়লে আত্মীয় কুটুম্ব আর তাকে ডাকবে না ?

একখানার বেশী ঘর ভাড়া করার সাধ্য কেশবের নেই। ওই একখানা ঘর আর কেশব হবে তার সম্বল।

যেখানেই ঘর নেওয়া হোক, ঘরটা বিচ্ছিন্ন নয়। আশেপাশে চারিদিকে ঘরে ঘরে মানুষ গিজগিজ করবে, ছেলের বিয়ে মেয়ের বিয়ে পূজাপার্ব্বণে মানুষের ভিড়ে নেমন্তন্ন পাওয়ার বদলে গাদাগাদি মাথামাথি ঘেঁষাঘেঁষি করে মানুষের যে ভিড়টা বসবাস করছে তার সঙ্গে পরিচয় হবে।

তারা কেউ জিজ্ঞাসা করবে না কেশবের সে বিয়ে করা বৌ কিনা। মন্ত্র পড়ে পুরুষটার সঙ্গে তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে অথবা সরকারী আইন তাকে পুরুষটার সঙ্গে থাকবার অনুমতি দিয়েছে —এটা কেউ খেয়ালও করবে না।

পরের সংসারে উদয়াস্ত খেটেও মায়া কি এটা জেনেছে ?

জানুক বা না জানুক। তার অসুখটা সারাবার জন্য মায়া মরতেও প্রস্তুত। এটা মুখের কথা নয়, কেশব জানে সে যদি মায়াকে বুঝিয়ে বলে যে শেষ রাত্রে তাকে গরু দুয়ে খানিকটা টাটকা দুধ খাওয়ানোর বদলে মায়া যদি গলায় কলসী বা পাথর বেঁধে ডোবাপুকুরে ডুবে মরে তাহলে সে সেরে যাবে—শেষ পর্য্যন্ত মায়া ডুবে মরবে নিজের ইচ্ছায়।

সমগ্র জীবনের হিসাবে কদর্য্য কুৎসিত হবে সেই আত্মহত্যা।

কিন্তু সমগ্র জীবন তো বলতে পারবে না মায়া মিথ্যাচারিণী, সে ভণ্ডামি করেছে, সমগ্র জীবনকে ঠকিয়েছে।

বৃহত্তর জীবনের হিসাব নিকাশ রীতিনীতি সে জানে না, জীবন সম্পর্কে সে তার নিজের জানা চেনা জগতের হিসাব নিকাশ রীতি-নীতিতে একনিষ্ঠা।

আকাশে এরোপ্লেন চলে, সে মুখ তুলে চেয়ে স্থাখে আর আওয়াজ শোনে।

তার কাছে এটা গরুড় পক্ষীর নতুন রূপের ম্যাজিক নয়। তার জ্যাঠতুতো ভাই বিষ্ণু আকাশে এরোপ্লেন চালিয়ে পেট চালায়।

মায়ার প্রস্তাব মন্দ কি ?

রাত্রির গোপনতায় চুপিচুপি মেলামেশার পালা শেষ করে কয়েকটি চেনা মানুষের সঙ্কীর্ণ পরিবেশ ত্যাগ করে এত বড় সহরের অন্য কোন এক কোণায় নতুন মানুষের মধ্যে গিয়ে বাসা বাঁধা ?

সংসারে তার শিকড় তো খুবই আলগা। মাসে মাসে কিছু টাকা দেয় আর প্রতিদিন বাড়ীর সকলে যখন ঘুমানোর আয়োজন করছে, ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন বাড়ী ফিরে কোনদিন দু'খানা রুটি খেয়ে কোনদিন না খেয়ে নিজের আলাদা ছোট ঘরটিতে ঘুমিয়ে বা ঘুমের জন্য ছটফট করে রাতটুকু কাটায়।

একটা বিক্ষোভ আর আলোড়ন সৃষ্টি না হলে, সকলে মিলে তাকে চেপে না ধরলে তার খেয়ালও হয় না যে বোনের বিয়ে দেওয়াটা অত্যন্ত জরুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নামে হলেও সে বাড়ীতে আছে এবং নামে হলেও সে বাড়ীর কর্ত্তা, গুরুতর ব্যাপারে তাই তাকে ডাকা, তার দায়িত্ব আর কর্ত্তব্য

স্মরণ করিয়ে দেওয়া। নইলে কার কি আসে যায় সে যদি রাতটুকু এখানে কাটাতে না আসে?

যে টাকা সংসারে দেবার কথা সেটা যদি ডাকে পাঠিয়ে দেয়?

তার টাকা নিতে কারো আপত্তি হবেনা। টাকায় কলঙ্ক লাগে না।

না, এই সংসারটি মোটেই তার সমস্যা নয়, এরা নামেই তার আপন জন। এদের সঙ্গে তার মিলও নেই মনের দিক থেকে, স্নেহমমতার বাঁধনও নেই। সে প্রায় অন্য জগতের মানুষ হয়ে গেছে।

এদের ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হবে না। নিয়মিত টাকাটা পেলে এরাও চোখের জল ফেলবে না তার জন্য—

কিন্তু তার উৎসাহ জাগছে কই? সাধ হলেও প্রিয়ার সঙ্গে একান্তে দু'দণ্ড কথা বলবার সুযোগ তার এখন নেই, পৃথিবী ঘুমোলে কখন তার সংকেত আসবে সেজন্য প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়, তবু সর্ব্বদা তাকে কাছে পাবার রোমাঞ্চকর কল্পনা হৃদয় মনে সাড়া তো জাগায় না তার? বরং নানারকম দ্বিধাসংশয় জাগে, ভয় করে। ঘর বাঁধার পর সর্ব্বদা কাছে পেয়ে মায়াকে যদি তার ভাল না লাগে? যদি বিস্বাদ হয়ে যায় তার সেবা যত্ন আর দরদ করার আকুলতা ব্যাকুলতা?

অন্ধকার থাকতে উঠে গোয়াল থেকে গোবিন্দের গরু দুইয়ে ঘাটে এসে সে যখন তাকে টাটকা দুধ খাওয়ায়, তখন সত্যই মনে হয় তার চেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ এ জগতে নেই। মনে হয় কাঁচা দুধ নয় যেন সত্যই অমৃত পান করছে।

কিন্তু নিজের ঘরে যত্ন করে রেঁধেবেড়ে আরও বেশী দরদ দিয়ে খাওয়ানোটা যদি একঘেয়ে লাগে? যদি মনে হয় ঘরে ঘরে মায়েরা বৌয়েরা যন্ত্রের মত এটা করছে, কি বৈচিত্র্য বা রোমাঞ্চ আছে তার সেবায়?

যেখানে আছে সেখানে তখন আর ফিরিয়ে আনা যাবেনা মায়াকে। মন বিগড়ে যাক, বিতৃষ্ণা জাগুক, তাকে বোঝা মনে হোক, সারাজীবন বিয়ে করা বৌয়ের মত তার বোঝা বয়ে চলতে হবে।

কি সাংঘাতিক কথা!

কিন্তু শুধু এইদিক দিয়েই কি সংঘাতিক কথাটা? মায়াকে তার ভাল না লাগতে পারে, সে বোঝা হয়ে উঠতে পারে, এই সম্ভাবনাটা?

এই আশঙ্কায় মায়াকে নিয়ে যদি তার নীড় বাঁধতে ইচ্ছা না হয়, মায়া এমন ব্যাকুল হলেও তার মধ্যে সাড়া না জাগে, মায়ার জন্য তার ভালবাসার মানেটা কি দাঁড়ায়?

কি দরের ভালবাসা এটা?

হিসাবটা তো জটিল নয় মোটেই। অতি সহজ সরল কথা। একটি দুঃখিনী নারী নির্ব্বিচারে তাকে দেহ মন দান করেছে, গ্রহণ করতে তার দ্বিধা জাগে নি কিন্তু মেয়েটির জন্য কোনরকম ঝঞ্ঝাট পোয়াতে সে রাজী নয়! গা বাঁচিয়ে গোপনে তার ভালবাসা ভোগ করতে সে প্রস্তুত আছে কিন্তু কোনরকম বাস্তব অসুবিধা বাস্তব দায়িত্ব মানতে তার রুচি নেই।

মায়া যেভাবে আছে এভাবে থাকলে তার কোন ভাবনা নেই। দরকার হলে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেই ফুরিয়ে গেল।

সে তো তবে অমানুষ, পাষণ্ড? সাধারণ স্বার্থপর লম্পট ছাড়া কিছুই নয়?

ছয়

অনিমেষের বুড়ী মা বড় মেয়ের কাছে এলাহাবাদ গেছে। জামায়ের খুব অসুখ।

চিকিৎসার জন্য কমলের কলকাতা আসার কথা। তবু অনিমেষের

মা নাতজামাইকে দেখতে ছুটে গেছে। তিনদিন কাশীতে তীর্থ করে কমল আর মলিনা দের সঙ্গে ফিরে আসবে।

কেশবের একটু বেলা করে কাজে গেলেও চলে। মায়া বলছে, তা তুমি যেও। কিন্তু ভোর রাত্রে ঘাটে গিয়ে দুধটা খেতে হবে।

একটু ভেবে বলছে, আচ্ছা থাক। আরাম ছেড়ে কেন উঠতে যাবে? আমিই জানালায় দুধটা দিয়ে আসব।

অন্ধকারে তার মুখটা মায়া দেখতে পায় না। দেখলে চমকে যেত।

কিন্তু কিছু একটা সে টের পেয়েছে।

: কদিন কি হয়েছে তোমার? কেমন যেন মন মরা আড়ষ্ট ভাব? আরও খারাপ হয়েছে নাকি শরীর?

: না। শরীর ঠিক আছে।

মিনুর বিয়ের কথাবার্ত্তা প্রায় হয়ে গেছে। ছেলেটির খবর দিয়েছিল গোবিন্দ।

গোবিন্দের নাকি সংসারে মন নেই, দিন দিন বৈরাগ্য বাড়ছে কিন্তু পাড়ার বিয়ে পৈতে শ্রাদ্ধ হোক, পূজা পার্ব্বণ হোক কিম্বা সরকারী আধা সরকারী সব অব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আর প্রতিবাদ জানাবার সভাই হোক—সব কিছুতে সে জড়িত থাকে।

আগে কোন ব্যাপারে তার টিকিটি দেখা যেত না, অবলার পক্ষাঘাত হবার আগে। বলত, সময় কই ভাই? দোকান দেখব, এত বড় সংসার দেখব, ঝঞ্ঝাট কি সোজা?

ক্রমে ক্রমে যত বৈরাগ্য বেড়েছে বাইরের অনেক কিছুতে জড়িয়ে পড়ার সময়ও তত বেশী পেয়েছে।

তবে রঞ্জনকে পড়ার বদলে দোকানের পিছনে কিছু সময় দিতে হয়। তা হোক। তার তো সখের পড়া। তাকে ওই দোকানটাই সম্বল

করতে হবে দু'দিন পরে। দিনরাত পড়েও ফেল করেছে দু'বার। শতকরা সত্তর জন ফেল করাদের দলটাকে সে ছাড়িয়ে উঠবে সে আশা কেউ রাখে না।

ভোরবেলা হঠাৎ গোবিন্দ আসে। কেশবকে দেখে বলে, তুমি বেরোও নি এখনো? ভালই হয়েছে! আমি ভাবছিলাম, প্রণবকেই জানিয়ে যাব কথাটা, তোমার সঙ্গে পরে আলোচনা হবে।

গোবিন্দ মাদুরে জাঁকিয়ে বসে। প্রণব এলে দু'ভাইকে তার বক্তব্য জানায়।

অবিলম্বে সে রঞ্জনের বিয়ে দেবে ঠিক করে ফেলেছে। ভেবেচিন্তে ওটাও ঠিক করেছে যে তারা যদি সম্মত হয় সে আর মেয়ে খোঁজাখুঁজি করবে না, মিনুর সঙ্গেই ছেলের বিয়ে দেবে।

: বয়সে বেমানান হবে না। তবে মিনুর বাড়ন্ত গড়ন, রঞ্জন আর একটু লম্বা চওড়া হলেই অবশ্য মানাত ভাল। সেজন্য আসবে যাবে না।

কেশব চমৎকৃত হয়ে বলে, হঠাৎ বিয়ে ঠিক করলেন কেন?

: খুলেই বলি তোমাদের। এবারও ফেল করে দুদিন একটু মুষড়ে গিয়েছিল, তারপর হঠাৎ দেখি দিব্যি তাজা ভাব। বললে, ব্যাপার কি জানো? আমাদের ইচ্ছে করে ফেল করিয়েছে, ইংরাজীতে কড়া হাতে নম্বর কেটেছে। পাশ করলে চাকরি দিতে হবে, তাই। গায়ের জোরে বেশী বেশী ফেল করিয়েছে, তারপর শুনলাম কি সব আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, পলিটিক্স করছে। তা করুক, তাতে কোন আপত্তি নেই। আখেরে হয় তো ভালই হবে। কিন্তু একে আনাড়ি তায় গায়ের জ্বালা, গোড়ায় বেসামাল হয়ে পড়বে। তাই ভাবলাম বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিই, যাই করুক একটু সামলে করবে।

কেশব বলে, মিনুর সঙ্গে হয়না গোবিন্দদা।

ঃ কেন? বাধা কি?

ঃ এক যায়গায় কথাবার্ত্তা প্রায় পাকা হয়ে গেছে—

ঃ তাতে কি? সব পাকা হবার পর সম্বন্ধ ভাঙ্গে না?

কেশব আমতা আমতা করে বলে, তাছাড়া, একেবারে পাশাপাশি বাড়ী, আমার কেমন ভাল লাগছে না।

গোবিন্দ গম্ভীর মুখে বলে, এই তো ভাল। তোমরাও ছেলের বিষয় সব ভালভাবে জানো, আমরাও মেয়েকে ভাল করে জানি। তাছাড়া ওই ছেলেটির চেয়ে আমাদের রঞ্জন নিশ্চয় পাত্র হিসাবে অনেক ভাল?

প্রণব বলে, তুমি আপত্তি করছ কেন? গোবিন্দদা মিনুকে নেবেন এতো আমাদের ভাগ্যের কথা।

গোবিন্দ উঠে দাঁড়য়।

ঃ তোমরা কথাবার্ত্তা বল। কালপরশু আমায় জানালেই হবে। এখানে দেনা পাওনা যা ঠিক হয়েছে তার বেশী আমি কিছুই চাইব না।

গোবিন্দ চলে গেলে প্রণব মাকে ডাকে। সুতরাং আদরিণী এবং পিসীরাও আসে। সেদিনের চেয়েও জোরালো সংঘাত বেধে যায় কেশবের সঙ্গে বাড়ীর সকলের।

বাজে একটা এপ্রেন্টিস ছেলের বদলে রঞ্জনের সঙ্গে মিনুর বিয়ে হবে শুনেই সকলে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে মনে হয়!

কেশবের যুক্তিহীন অর্থহীন অসম্মতির মানেই কেউ বুঝতে পারে না।

মা বলে, একি একগুঁয়েমি তোর, এ্যাঁ? তুই কি পণ করেছিস আমরা সবাই যা বলব সেটাই তুই ভেস্তে দিবি, ঠিক উল্টোটা গাইবি?

প্রণব বলে, এ চলতে পারে না। আমরা সবাই যখন চাইছি, রঞ্জনের সঙ্গে মিনুর বিয়ে হবে। তুমি সেদিন বাড়ী বেচে দেবার ভয় দেখাচ্ছিলে, দিও বাড়ী বেচে। খরচপত্র বন্ধ করে দিও। আমি যে ভাবে পারি চালাব।

মিনু একটু তফাতে দাঁড়িয়ে শুনছিল। ছোটদার দৃঢ়তা দেখে তার মুখখানা যেন হয়ে ওঠে

কেশব টের পায়, এ বিয়ে ঠেকাবার সাধ্য তার হবে না। বিশেষত গোবিন্দ যখন বিশেষভাবে মিনুকেই ছেলের বৌ করতে ইচ্ছুক।

ভিতরে একটা প্রচণ্ড বিক্ষেপ অনুভব করে কেশব। ক'দিন মায়ার জন্য ছিল আত্মগ্লানি, আজ তার সঙ্গে মিশেছে ক্ষোভ।

কাজে যেতে হবে। তৈরী হয়ে সে পথে নেমে যায়। বিপিনদের বাড়ীর সামনে একটি মোটর দাঁড়িয়েছিল। সিনেমা তারকা হবার মত রূপসী একটি মেয়ে বাড়ীর সামনের রোয়াকে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল বকুলের সঙ্গে। দুজনেরি ঝকঝকে তকতকে আধুনিক সাজ।

সেইখানে সামনা সামনি দেখা হয় মোহিনীর সঙ্গে। শরতের বাগানের পুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে ফিরছিল।

আশ্চর্য্য এই যে, আজ তাকে এভাবে রাস্তায় দেখে কেশবের চমক লাগে না। আপশোষ জাগে।

ঃ কেশব বাবু আজ এত দেরী করে বেরোচ্ছেন!

মোহিনী দাঁড়ায় সেই অবস্থায়, সভ্য জগতের সুসজ্জিতা মেয়ে দু'টির কয়েক হাত তফাতে। বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেনা।

বলে, তোমার তো গাড়ী আছে, একটু বেড়িয়ে আনো না। ভাল লাগে না আর। একজন থালি নেয়ে বলবে আমি

নাই নি, খেয়ে বলবে আমি খাই নি, কোথায় একটু নিয়েও যাবে না, ঘর থেকে বেরোতে দেবে না। এমন বিশ্রী লাগে!

প্রাণটা বোধ হয় তার ছটফট করছিল এই কথাগুলি কাউকে শোনাবার জন্য। কথাগুলি বলেই সে এগিয়ে যায়।

এত বিব্রত ছিল কেশবের মন, তবু আজকেই প্রথম তার খেয়াল হয় যে পুকুরে গামছা পরে নাওয়া আর ভিজে কাপড়ে বাড়ী ফেরাটা মেয়েদের লজ্জাহীনতা বা অসভ্যতা নয়, নিছক দুর্দ্দশা!

ক'টা পুকুর আছে আশে পাশে। মেয়েদের নাইতে তো হবে! পুকুর ছাড়া নাইবে কোথায়? পুকুর পাড়ে খোলা জায়গায় কাপড় ছাড়া ঢের বেশী লজ্জাকর, তার চেয়ে ভিজে কাপড়ে বাড়ী ফেরার অসভ্যতাটুকুই ভাল।

উপায় কি?

বোসপাড়ার রাস্তার মোড়ে ভুবনেশ্বরের সঙ্গে দেখা। তার হাতে ওষুধের শিশি।

: কার ওষুধ ভুবনদা।

: তোমাদের বৌঠানের, আবার কার! জ্বর বাধিয়ে বসেছে। জ্বর যতটা নয়, গায়ে জ্বালাপোড়া বেশী।

তাই বটে। ভুবন গিয়েছে ডাক্তারের কাছে ওষুধ আনতে সেই ফাঁকে মোহিনী গা জ্বালাপোড়ার চিকিৎসাটা সেরে রেখেছে। পুকুরে ডুব দিয়ে এসে।

রোগ সম্পর্কে জীবন সম্পর্কে মায়ারও এমনি অবজ্ঞা। ভূতের ভয়ে মূর্চ্ছা যাক, জ্বর গায়ে স্নান করে মরে পেত্নী হয়ে সেই ভূতের দেশে যেতে এদের আপত্তি নেই।

শরতের দোকান থেকে অজিত তাকে ডাকে। সকালে শরৎ দোকানে হাজির থাকে। তাকে কয়েক মিনিটের জন্য খদ্দের সামলাবার ভার দিয়ে অজিত দোকানের বাইরে আসে!

বলে, কানুকে তো আপনি ভালমত চেনেন। স্বভাব চরিত্র কেমন ওর ?

ঃ স্বভাব ভালই।

মদ টদ খাওয়া ?

ঃ আপনার আমার মত কদাচিৎ সখ হলে খায়।

ঃ সে কথা বলছি না। নেশা টেশা নেই তো? রোজগার করছে, এতকাল বিয়ে থা' করেনি, এটা কেমন খাপছাড়া লাগছিল।

কেশব একটু হেসে বলে, এক হিসাবে খাপছাড়া বলতে পারেন, তবে খারাপ কিছু নয়। ও বলে কি, চোদ্দপুরুষ কখনো হাতের কাজ করে খায় নি, বংশে আমি প্রথম খাঁটি মিস্ত্রী বনেছি। গেরস্ত ঘরের ছিচকাঁদুনে মেয়ে ঘরে এনে মরব ?

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করে, কানুর বিষয়ে এত খোঁজ খবর কেন ?

অজিত চিন্তিত ভাবে বলে, অনেকদিন থেকে মেয়েটাকে বিয়ে করার কথা বলছে। তা বাড়ীর মেয়েরা বলছিল, দিলে মন্দ হয় না। বৌমার বিশেষ ইচ্ছা এখানে হোক। বলে কি ও যা মেয়ে এরকম লোকের হাতে পড়লেই সুখী হবে। চা'করে বাবু গোছের ছেলের সঙ্গে বনবে না। কি করব তাই ভাবছি। মেয়েটা একটু কাঠ খোট্টাই বটে, মায়া দয়া কম।

কেশব বলে, ওর সাথেই দিয়ে দিন। মানুষটা খাঁটি। ভদ্রঘরের বৌ হতে না পারলেও মেয়ে আপনার সত্যি সুখী হবে।

কানু মানুষটা খাঁটি বৈকি। তার মত ভেজাল মানুষের তুলনায় কানু নিশ্চয়ই খাঁটি মানুষ।

তার মত কারো জীবনে বোধহয় এমন এলোমেলো রীতিনীতি, উল্টোপাল্টা যুক্তি তর্কের কারবার নেই। নিজের প্রয়োজনে যখন যা সুবিধা তাই সে উচিত বলে জানে, তাই সে করে। আত্মীয় বন্ধুর মুখ-চাওয়া রীতিনীতি নিয়ম কানুনের ধার সে ধারে না।

তার চেয়ে প্রণবও বেশী খাঁটি মানুষ। যত কুসংস্কারের জের টেনে চলুক, যতই সঙ্কীর্ণ হোক তার মন, যত তুচ্ছ স্বার্থ নিয়েই হোক তার কারবার।

তার সংস্কার সঙ্কীর্ণতা স্বার্থপরতা আত্মকেন্দ্রিক সুবিধাবাদ নয়, একটা ব্যাপক জীবনের নিয়ম-অনিয়ম, নীতি-দুর্নীতিকে নিজের জীবনেও স্বীকার করা, সম্মান দেওয়ায় নিদর্শন। অনেকে যে রকম মানুষ, অনেকের যেমন জীবন সেও তেমনি মানুষ হতে, তেমনি জীবন পেতে চায়।

কিন্তু তার তো কোন নিয়ম নীতিরই বালাই নেই। ন্যাকামি আর ছুঁচিবাই ভরা সঙ্কীর্ণ সেকেলে পচা জীবনযাত্রা আঁকড়ে আছে ব'লে বাড়ীর মানুষেরা তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে, ওদের সুখ দুঃখ নিয়ে এতটুকু মাথা না ঘামিয়েও একটু করুণা মেশানো অবজ্ঞার দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকায়, কে মরল কে বাঁচল খবর নেওয়াও প্রয়োজন বোধ করে না।

অথচ বড় বড় পারিবারিক ব্যাপারে ঠিক ওদের পর্য্যায়ের বাড়ীর কর্ত্তাটির মতই সে তর্জ্জন গর্জ্জন করে, হুকুম দেয়, প্রত্যাশা করে সকলে মাথা নিচু করে তার বিচার মেনে নেবে।

এ সংসারের মানানসই বৌ সে চায় না, অথচ তেমনি একজনের, একই ধরণের দাসীর মত আত্মসমর্পণ আর ভাবালু স্নেহ ভালবাসা চোরের মত উপভোগ করে।

ড্রাইভারদের সঙ্গে সে মিশতে পারে না। তাদের মোটা রসিকতা আর সস্তা খোসগল্প তার পছন্দ হয় না।

অথচ সমকর্ম্মীদের একেবারে উপেক্ষা করার সাহস তার নেই। কর্ম্মজগতের খবরাখবর এদের কাছে জানা যায়, এদের মারফতে কাজ পাওয়াও যায়। ইয়াকুব তাকে জ্যাকসনের চাকরীটা জুটিয়ে দিয়েছিল জ্যাকসন দেশে চলে গেলে অনিমেষের এই চাকরীর খবরটা তাকে দিয়েছিল ডাক্তার ঘোষের ড্রাইভার সুখলাল।

একটু মেলামেশা বজায় রাখতে হয়! কিন্তু সেটা প্রাণখোলা মেলামেশা নয়, তার শুধু অভিনয় করা যে আমিও তোমাদের মতই বড়-লোকের মাইনে করা ড্রাইভার।

ললনাদের স্তরের শিক্ষিত মার্জ্জিত আধুনিক মানুষদের জন্যও সে প্রায় বোসপাড়ার সেকেলে পচা মানুষগুলির মতই করুণা মেশানো অবজ্ঞা পোষণ করে।

এদের শুধু বাইরের জাকজমক ভিতরে ফাঁকি। প্রাণান্তকর চেষ্টায় একটা ধোঁয়াটে কৃত্রিম আবহাওয়া সৃষ্টি করে বাস্তব জগত আর জীবনকে ঝাপসা করে রাখে। কত হীনতা দীনতা অনিয়ম যে চাপা থাকে চকচকে পালিশ করা প্রকাশ্য জীবনের আড়ালে! কত দুঃখ বেদনা পঙ্গুতা ব্যর্থতা যে সর্ব্বসম্মতিক্রমে চাপা দিয়ে রাখা হয় হাসি গান আর জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্যের তৈরী করা মিথ্যা সার্থকতার আবরণে!

কত বছর ধরে মাসের পর মাস কয়েকটা দিন ললনা যাতনায় কাতরে আসছে, একটু বাতাসের জন্য দু'হাতে হাঁটু জড়িয়ে বসে চোখ কপালে তুলে হাঁপিয়ে আসছে, কিন্তু কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বন্ধু ছাড়া কেউ জানেও না তার কি অসুখ, জানার প্রয়োজনও বোধ করে না।

ললনার শরীর ভাল নেই শুনেই তার প্রকাশ্য জীবনের শতাধিক ভাগিদাররা কয়েকটা দিনের জন্য তাকে রেহাই দেয়।

অথচ বিতৃষ্ণা আর অশ্রদ্ধা নিয়েও ড্রাইভার হিসাবে যতটা সম্ভব এই জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মশগুল হয়ে থাকে। মুখ ফুটে কিছু না বলেও ললনার সঙ্গে তার একটা বোঝাপাড়া হয়ে গেছে যে, যত বই আর পত্রিকা ললনা পড়ে সেগুলি যেন তার না পড়ার সময়টুকুর জন্য কেশবকে ধার দেওয়া হয়;

এজন্য ললনা যে তাকে ছোটলোক অশিক্ষিত ড্রাইভার ভাবে না, লেখাপড়া জানা খানিকটা ভদ্র মানুষ মনে করে এটুকুর জন্যই সে গর্ব্ব বোধ করে।

উৎসব-আসর সভাসমিতির যত কাছে ঘেঁষা সম্ভব ঘেঁষে গিয়ে সে যেটুকু পারে গান শোনে, আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্ক বক্তৃতা শোনে, গাড়ী চালাতে চালাতে অর্দ্ধেক মন দিয়ে শোনে আর বুঝবার চেষ্টা করে এদের কথা বার্ত্তা।

এইভাবে সে নিজেকে অংশীদার করতে চায় এদেরও জীবনের। সে তবে বাদ দিল কোনটা? আপন হল কোন স্তরের মানুষগুলির? এর সোজা মানে কি এই নয় যে সে সুবিধাবাদী এবং সেজন্য সব স্তরের সমস্ত রকম জীবনের ভাগ চেয়ে তার গুলিয়ে গেল সে নিজে কোন রকম জীবন চায়।

ললনা বলে, আপনাকে তো বেশ তাজা দেখাচ্ছে আজ। বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছেন বুঝি?

আজ পর্য্যন্ত কখনো ললনা এভাবে এই সুরে কথা বলে নি। একদল রুক্ষ কেশ ছিন্নবেশ চাষী মা বৌকে খেটে কিছু রোজ-গারের চেষ্টার শেষে দল বেঁধে গাঁয়ে ফিরতে দেখে সে অনেক ইতস্তত

ক'রে তাদের পিছু ধাওয়া করেছিল। ঘণ্টা দেড়েক গ্রামে কাটিয়েছিল।

সেইজন্তই কি এই প্রসন্নতা? সে বিয়ে করেনি জেনেও এই সুমিষ্ট রসিকতা?

কেশবও হাল্কা সুরে বলে, আমি করো সঙ্গে ঝগড়া করিনা। গাড়ীটা আমার সঙ্গে ঝগড়া সুরু করেছে।

ললনা ভড়কে গিয়ে বলে, কি হয়েছে গাড়ীর?

: গাড়ীটা পুরোনো হয়ে গেছে। সেদিনের ধাক্কাটা সামলাতে পারছে না। বেশীদিন চলবে না আর। বাবুকে বলে একটা নতুন গাড়ী কিনুন।

ললনা একটু হাসে।

গাড়ীটা নতুন হলে বাবা বিক্রী করে দিত। আমরা খুব আরামে আছি ভাবেন, না? খাই দাই গায়ে ফু দিয়ে ঘুরে বেড়াই, আকাশ ফুঁড়ে টাকা আসে, ভাবনা কি! আমাদেরও সেদিন আর নেই, কাহিল অবস্থা।

গান বন্ধ করে, নানা মত নানা স্বার্থের নানা লোকের সঙ্গে ভদ্র ও মার্জ্জিত ভাবে সমঝে চলার বিষম প্রক্রিয়াটা বাতিল করে, প্রতিদিন উদার আকাশ খোলা মাঠঘাটের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে গিয়ে ভাস্তা কুঁড়ের আধা ন্যাংটো খিদেয় কাতর নোংরা ক্ষুব্ধ মানুষগুলির সঙ্গে ভাসা ভাসা পরিচয় করে চেহারা যেন ফিরে গেছে ললনার।

এবারের বিছানা নেবার নির্দ্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে। তাকে হাঁপাতে হয় নি। কতটা ব্যথা ভোগ করেছে সে-ই জানে কিন্তু বিছানা তাকে নিতে হয়নি।

ললনা আবার বলে, বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, গরীবের দেশ কিনা, বেশীর ভাগ লোক খেতে পায় না, পরতে পায় না রোগে

ভুগে মরে। তাই মনে হয় আমরা বুঝি মস্ত চালে চলি, লাখপতিদের মত মজা লুটি। চালটা কোথায়? মজাটা কোথায়? এই তো একটা বাড়ী, দিদিরা এলে ঘরের ব্যবস্থা কি হবে ভাবতে হয়। এই তো একটা গাড়ী। ফার্ণিচারগুলো দরকারী, শাড়ী কাপড় পোষাকগুলো দরকারী। বাড়াবাড়িটা কোথায়?

কেশব স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে?

: ওই গরীবদের সঙ্গে তুলনা করলে তবেই বলা যায় চালে আছি, বাড়াবাড়ি করছি। এত লোকের ভাঙ্গা কুঁড়ে, আমাদের কেন মডার্ণ ফ্যাশনের পাকা বাড়ী থাকবে? এত লোকে গরুর গাড়ীতেও চাপতে পায় না, আমরা কেন মোটর গাড়ীতে চাপব। এত লোকের চুলে জট গায়ে মাটি, নেংটি পরে আধপেটা খায় আবার না খেয়েও মরে—আমরা কেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকব, ভাল পোযাক পরব ভাল খাবার খাব?

ললনা বেশ বলতেও পারে। গানের চাপা আবেগটা বোধ হয় কথায় মুক্তি খুঁজছে।

: হাবাতের সঙ্গে তুলনা করলে তবেই মনে হবে আমরা বিলাসী। নইলে আজকের দিনে এটুকু সুখ সুবিধা মানুষ ভোগ করবে না? আরও বেশী পাওয়া উচিত। সেটাও বিলাসিতা হবে না, চাল হবেনা।

এ পর্য্যন্ত বেশ লাগে ললনার কথাগুলি। সহজ কথা, কেশব বুঝতেও পারে মানতেও পারে। সত্যই তো, মানুষের সভ্যতা ভাল ভাল বড় বড় কথার সভ্যতা নয়, ভালভাবে বাঁচার সভ্যতা।

গাড়ী থাকা বাড়ী থাকা সোফা টেবিল্ আলমারি থাকা পরিচ্ছন্নতা আর একটু শোভা ও সৌন্দর্য্যের ব্যবস্থা থাকা, সুবেশ ও সুস্বাদু খাদ্যে রুচি থাকা—আজকের দিনের সভ্যতার মাপে এসব তো নিছক

প্রাথমিক ব্যাপার, সামান্য ব্যাপার। এ সমস্তকে বিলাসিতা বা চাল বলতে হলে তার মানে দাঁড়ায় একমাত্র ভেকধারী সন্ন্যাসীর বিলাসিতা বা চাল নেই!

কিন্তু তার পরেই ললনা সব গুলিয়ে দেয়।

বলে, গরীবের ঘাড় ভেঙে আমরা যদি টাকা জমাতাম তাহলেও বরং বলা চলত।

তার অজ্ঞতায় কেশব পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

ঃ গরীবের ঘাড় ভেঙ্গে যারা টাকার কাঁড়ি করে তারাই আপনাদের দেয়।

ঃ দেয় না, আমরা আদায় করি। আমাদের ছাড়া ওদের চলে না!

ঃ গরীবদের ছাড়াও চলে না। আপনাদের টাকাও আসলে গরীবের টাকা। ওরা গরীবকে শোষণ করে, আপনারা তারই একটু ভাগ পান।

ললনা একটু হাসে।—টাকা আবার গরীবের বড়লোকের ছাপ মারা হয় নাকি!

ঃ হয় না? বইয়ে কি লেখে জানিনা, সে বিদ্যে নেই, সোজা কথায় বুঝি আমার টাকা আপনি কেড়ে নিলে সেটাকে আমার টাকাই বলব। দশজনকে গরীব করে একজন তাদের টাকা নিলে সেটা গরীবের টাকা হল না?

কে জানে ললনা মেনে নেয় কি না তার কথা! অথবা তার সঙ্গে তর্ক করতে চায় না বলে চুপ করে যায়।

ললনার মধ্যে একটা অস্থিরতা দিন দিন বাড়ছে লক্ষ্য করা যায়। সারাদিন সে যেন ছটফট করে বেড়ায়। কতবার যে উদ্দেশ্যহীনভাবে বসবার ঘরে আসে, একটু বসেই উঠে দাঁড়ায়, লনে নামে, গ্যারেজে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ শুধু গাড়ীটার দিকে চেয়ে থেকে ফিরে যায়।

এবার আক্রমণ হয়নি, রোগ হয় তো তার সত্যই সেরে গেল। কিন্তু তেমন খুসী মনে হয় না ললনাকে।

রোগ সারাবার জন্য যে মূল্য তাকে দিতে হয়েছে সেটা বোধ হয় তাকে পীড়ন করছে খুব।

অন্যের লেখা গান অন্যের দেওয়া সুরে যে গায় সেও সৃষ্টিই করে, প্রাণের আবেগ খরচ না করে যন্ত্রের মত গেয়ে কেউ মানুষকে মাতাতে পারে না।

সেদিন বিকালে বেরোবার আগে কেশব জানায়, তেল নিতে হবে।

ললনা বাড়ীর ভেতর থেকে ঘুরে এসে বলে, থাকগে আজ আর বেরোব না।

কেশব বলে, বেণীবাবুর ওখান থেকে এমনি পাওয়া যাবে। দাম পরে দিলেও চলবে।

ললনা বলে, নাঃ, ধারে তেল কিনে বেড়াব না!

সাত

শুনেছিল অনিমেষের পদোন্নতি হয়েছে, কিছু মাইনেও বেড়েছে। কিন্তু সকলের রকম সকম দেখে মনে হয় তার যেন সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

নতুন গাড়ী কেনার কথা বললে ললনা বলে যে গাড়ীটা নতুন হলে বেচে দেওয়া হত।

তেল কেনার টাকার অভাবে তার বেড়ানো বন্ধ রাখতে হয়।

তারপর সে জেনেছে ব্যাপার! কিছু বেশী বেতনের নতুন একটা পদে উন্নতি হওয়াটা সত্যই অভিশাপ দাঁড়িয়ে গেছে অনিমেষের।

এ পদে উপরি আয় নেই একটি পয়সা।

তাই বটে: এরকম একটা বাড়ী করে মাইনে করা ড্রাইভার,

রান্নার লোক আর দুজন চাকর রেখে যে চালে চলে অনিমেষ, আজকের দিনে বড় চাকরীর মাইনেতে কি আর তা সম্ভব হয়।

শত্রুতা ঠিকই করেছে বঙ্কিম। পদোন্নতি করিয়ে দিয়ে গায়ের জ্বালা মিটিয়েছে।

চাল খাটো করার, খরচ কমাবার ব্যবস্থা চলেছে।

কেষ্টকে বিদায় দেওয়া হয়েছে, নির্ম্মলাই এখন থেকে রান্না করবে।

চাকর একজন রাখতে হবে। অর্জ্জুনকে রাখা দরকার কিন্তু নিমাইকে না রাখলেও চলে।

শুনে নিমাই-এর সে কি কান্না!

না, সে কিছুতেই দেশে ফিরে যাবে না, এখানেই থাকবে।

আমার মাইনে কমিয়ে দাও দিদিমণি, আমায় ছাড়িয়ে দিও না!

এই সে দিনও তার মন কেমন করত দেশের জন্য, মায়ের জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত। আজ দাঁড়িয়েছে বিপরীত। এবাড়ীর চাকরী ছেড়ে সহর ছেড়ে দেশে ফিরে যাবার নামে তার কান্না আসে।

কান্না থামিয়ে সে কিছুক্ষণ ভাবে। তারপর বলে, আচ্ছা, আমি তবে একটা কাজ খুঁজে নিই। তদ্দিন আমায় রাখবে তো?

ললনা বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ রাখব। আমিই কাজ জুটিয়ে দেব'খন তোকে একটা।

নিমাইকেও কেশব যেন আজ ঈর্ষা করে! গেঁয়ো ছেলে কিন্তু কত সহজে সে রপ্ত করে নিয়েছে সহরের জীবন আর চালচলন। শুধু তাই নয়, কানুর মত তাকেও মন স্থির করতে দশবার ভাবতে হয় না, ইতস্তত করতে হয় না। সেও নিজের মনটা বোঝে! সহরে সে থাকতে চায়, সহরেই সে থাকবে। দেশে যাবার নামে কাঁদতে

কাঁদতেই সে ঠিক করে ফেলতে পারে এবাড়ীতে না রাখলে অন্ত বাড়ীতে কাজ খুঁজে নেবে।

তাকে হয় তো কয়েকদিন রীতিমত মাথা ঘামিয়ে ঠিক করতে হত দেশে ফিরবে না সহরে থেকে যাবে। ঠিক করার পরেও থেকে যেত দ্বিধার ভাব।

কেন? তার অসুখটার জন্য?

নিজেকে নিষ্ঠুরভাবে একটা প্রচণ্ড আঘাত হানতে ইচ্ছা হয় কেশবের

ভোরে কাজে এসে ললনাকে গান গাইতে শুনে কেশব আশ্চর্য্য হয়ে যায়!

ললনার ধৈর্য্যের বাঁধ তবে ভেঙ্গে গেল? গানের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল রোগের যাতনা?

সেদিন ভোরে বুড়ীকে গঙ্গা নাইয়ে এলে সে আরও আশ্চর্য্য হয়ে যায় ছোট বড় চারটি মেয়েকে ললনা গান শেখাচ্ছে দেখে। মলিনা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছে।

ললনার আনন্দোজ্জ্বল মুখ যেন তার মুখের স্থায়ী বিষণ্ণতাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

শিক্ষার্থিনীদের মধ্যে দুটি মেয়ে পাড়ার, দুজনকে কেশব কথনো ভাখে নি।

ঘড়ি ধরে ঠিক এক ঘণ্টা শিখিয়ে ললনা তাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে বিদায় দেয়।

খানিক পরেই আসে জীবন আর শঙ্কর, ললনার সঙ্গে এই যুবক দু'টির অনেকদিনের আলাপ। সামনের শনিবার সন্ধ্যায় তারা একটি সভার আয়োজন করেছে, ললনাকে গিয়ে দু'একখানা গান গাইতে হবে।

ললনা বলে, এবার টাকা দিতে হবে কিন্তু।

টাকা? জীবন আর শঙ্কর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

: কত টাকা?

: বনানীদি যা পান। অনেক পয়সা খরচ করে গান শিখেছি। এবার কিছু উসুল করবই।

কেশব ভাবে, ব্যাপারটা কিরকম হয়? গানের জন্য নয়, টাকার জন্য? ওরকম বিশ্রী কঠিন একটা রোগ থেকে আরোগ্য লাভের চেয়ে টাকাটা বড় হল ললনার কাছে!

চিন্তাটা এমন পীড়ন করে তাকে যে, সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে ললনার কাছে গিয়ে বলে, আবার গান আরম্ভ করলেন নাকি? অসুখটা সেরে যাচ্ছিল—

ললনা একটু হাসে।

: গান না গাইলে আমার চলে না। সব শূন্য মনে হয়।

কেশব ধাঁধায় পড়ে যায়। তাহলে গানের জন্যই? টাকার খাতিরে নয়?

তার মুখের ভাব দেখে ললনা বলে, তাছাড়া ভেবে দেখলাম, ঠিক গানের জন্যই তো অসুখ নয় আমার। কারণ হল আমার নার্ভাস উইক্‌নেস, একটু যদি সামলে চলি, মনটাকে শক্ত রাখি, গানের জন্য কেন অসুখ হবে? এতলোক গান গায় তাদের হয় না, আমার কেন হবে? অনিয়ম বাদ দিয়ে, ভাল ফুড আর টনিক খাব—

ললনা আবার একটু হাসে।

তাছাড়া, এবার শুধু ভাবের জন্য নয়, টাকার জন্য গাইব সেরকম স্ট্রেইন আর হবে না। তবু যদি ভুগতে হয়, ভুগব!

চিকিৎসার জন্য কমলের কলকাতা আসার দিন ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছিল। অনিমেষের মা-ও এলাহাবাদে নাতনীর কাছে আটকে গিয়েছে। কমলের অসুখটা কি স্পষ্ট করে এখানে কেউ জানায় নি, শুধু লেখা হয়েছে যে স্নায়বিক রোগ।

কয়েকদিন পরে বিমান ডাকে কমলের ভাই নির্ম্মলের চিঠি আসে। কেবল কমল আর মলিনা নয়, তারা সকলেই কলকাতা আসছে। অবিলম্বে যেমন হোক একটি বাড়ী ভাড়া করে যেন টেলিগ্রাম করে তাদের জানানো হয়।

বাড়ী দরকার এইজন্য যে কমলের চিকিৎসায় বেশ কিছুদিন সময় লাগবে।

অনেক চেষ্টায় একটা ফ্লাট যোগাড় হয়। এলাহাবাদে টেলিগ্রাম যায়। দিন চারেক পরে অনিমেষ আর ললনাকে কেশব ষ্টেসনে নিয়ে যায়।

মাস ছয়েক আগে কমল আর মলিনা কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল, কেশব তখন কমলকে দেখেছিল।

সুশ্রী চেহারা, খুব হাসিখুসি আমুদে মানুষ।

আজ দু'পাশ থেকে দু'জন লোক সেই কমলকে শক্ত করে ধরে হাঁটিয়ে আনছে দেখে কেশব পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে।

কমল কাছে আসবার আগেই সে ব্যাপার বুঝতে পারে। মানুষ পাগল হলে তাকে দেখলেই সেটা টের পাওয়া যায়।

কমলের মাথাও কামানো।

অন্য কাউকে কেশব চেনে না। বছর তিরিশেক বয়সের যে যুবকটি কমলকে ধরে আনছে, দেখে মনে হয় সে কমলের ভাই নির্ম্মল। বিধবা মহিলাটি খুব সম্ভব কমলের মা।

পরে কেশব জানতে পারে প্রৌঢ় বয়সী পুরুষটি কমলের কাকা,

মহিলাটি তার স্ত্রী এবং কুড়ি বাইশ বছরের অন্ত যে তরুণটি কমলকে ধরে আনছিল সে এদের ছেলে।

ললনা মলিনা কেউ এদের সঙ্গে আসে নি।

একটা গাড়ীতে কুলোবে না, ট্যাক্সি ডেকে মানুষ ও মালপত্র ভাগাভাগি করে তোলা হয়। কমলকে নিয়ে অনিমেষ নির্ম্মল আর সেই ছেলেটি এগাড়ীতে ওঠে।

হঠাৎ কেশবের চোখে পড়ে, ষ্টেসনের ভিতরে দূরে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে ললনা মলিনা আর অনিমেষের মা এদিকে চেয়ে আছে।

অনিমেষ গাড়ীতে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

নির্ম্মল বলে, প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম নার্ভাস ব্রেকডাউন। ডাক্তারও তাই বলেছিলেন। তারপর জানা গেল মাথার গোলমাল।

অনিমেষ জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের বংশে কারো—?

ভিড়ের জন্ত গাড়ী তখন দাঁড়িয়ে ছিল মুখ ফিরিয়ে কেশব নির্ম্মলের বিমর্ষ মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখতে পায়।

ধীরে ধীরে নির্ম্মল বলে, বাবার একবার হয়েছিল। ছ'মাস পরে সেরে যায়।

বোধ হয় ঢোঁক গিলবার জন্তই সে একটু থামে।

: কাকার কাছে শুনলাম, এটা নাকি আমাদের বংশের ধারা। একবার অ্যাটাক হয়, ছ'মাস একবছর চিকিৎসার পর সেরে যায়। কাকারও হয়েছিল। বিশেষ চিকিৎসা আছে, দাদারও সেই চিকিৎসাই হবে। যে কবিরাজ বাবার চিকিৎসা করেছিলেন তিনি বেঁচে নেই, তবে তার ছেলে আমাকে জানিয়েছে যে মরার আগে তিনি আমাদের বংশের এই অসুখটার চিকিৎসার সমস্ত খুঁটিনাটি লিখে রেখে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন।

কমল একটা গোঙানির মত আওয়াজ করে উঠবার চেষ্টা করে। মিনিটখানেক ধস্তাধস্তি করে আবার ঝিমিয়ে যায়।

কাকা বললেন, প্রত্যেকটি লক্ষণ বাবার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। অন্য কাউকে চিনতে পারে না, কিন্তু বৌদিকে দেখলেই দাদা রেগে ওঠে, মারতে যায়। বাবাও মাকে দেখলেই ভায়োলেণ্ট হয়ে যেতেন। বৌদিকে সব বলেছি, আপনিও বুঝিয়ে বলবেন, বেশী যেন মন খারাপ না করেন। দাদা ঠিক সেরে যাবে, হয় তো ছ'মাসও লাগবে না।

অনিমেষ কাতর ভাবে বলে, এটা ঠেকানো যায় না? একবার হবেই সকলের?

নির্ম্মলও কাতরভাবে বলে, হবেই বলা যায় না, সম্ভাবনা আছে। জ্যাঠামশায়ের হয় নি, তার বড় ছেলের বয়সও প্রায় পঞ্চাশ হল, তার হয় নি। কতগুলি নিয়ম পালন করলে নাকি ঠেকানো যায়। বাবা আমাদের ছেলেবেলা থেকে মাছমাংস খেতে দিতেন না, বার বার বলতেন কখনো যেন সিগারেট না ধরি। আরও অনেক নিয়ম মানাতেন, শিখিয়ে দিতেন। আমার চেয়ে দাদা এসব ভাল জানত, বড় হয়ে গ্রাহ্য করে নি। আমাদের মাছমাংস সিগারেট সব চলেছে। কিছুদিন থেকে ক্লাবে গিয়ে দাদা একটু একটু ড্রিঙ্ক করছিল। আমরা টের পাইনি, বৌদিকে বলেছিল যে ক্লাবে পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে হয়, এক আধ পোয়া না খেলে মেলামেশা যায় না।

ড্রিঙ্ক সুরু করার ঠিক দু'তিন মাসের মধ্যে অ্যাটাক্‌টা হল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে অনিমেষ বলে, তোমরা তোমাদের চিকিৎসা চালিয়ে যাও, আমি একজন স্পেশালিষ্টকে দেখাব।

গাড়ী চালাতে চালাতে কেশব ভাবে, তার অসুখ বেড়ে চলতে চলতে একদিন সেও যদি পাগল হয়ে যায়?

আশ্চর্য্য কিছুই নয়। কমলের মত সুস্থ সবল হাসিখুসী মানুষটার মাথা যদি হঠাৎ এমন ভাবে বিগড়ে যেতে পারে, তার মাথায় গোলমাল হয়ে যাওয়া অসম্ভব কি।

আশ্চর্য্য এই যে কথাটা ভেবে নির্ম্মলের মত তার আতঙ্ক জাগে না। পাগল যে হয়ে যায় তার ভাবনাই বা কি থাকে দুঃখ কষ্টের বোধই বা কি থাকে? পাগল হলে তো আর চেতনা থাকে না যে আমি পাগল হয়েছি!

অনি আর্থিক অসুবিধা হচ্ছে। তবু সে জামাইকে স্পেশালিষ্ট দেখাবে।

রোগটা কি এবং কেন যদি জানা যায়। যদি অল্পদিনে রোগ সারবার উপায় থাকে। রোগ সারলেও আক্রমণের অনেক নিদর্শন রেখে যাবে নিশ্চয়। কমলের কাকাকে দেখলেই সেটা টের পাওয়া যায়। পাগল না হলেও মানুষটা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়, মাথার মধ্যে অনেকরকম পাগলামি বাসা বেঁধে আছে।

কমলের বেলা এর যতটা সম্ভব প্রতিকার যদি করা যায়।

তার রোগের কোন স্পেশালিষ্ট নেই? কেশব ভাবে। কেউ বলে দিতে পারে না কি তার অসুখ, কেন সে ভুগছে, এ রোগের আরোগ্য আছে কি নেই?

স্পেশালিষ্ট অবলার পক্ষাঘাতের কারণ পষ্ট বলে দিয়েছে—মেরুদণ্ডের ভিতরে কি যেন হয়েছে তার। একথাও জানিয়ে দিয়েছে যে অবলার সেরে উঠবার আশা নেই।

জেনে অবলা যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে।

তার যদি এ জীবনে আরোগ্য লাভের আশা না থাকে, সেটা জানাই ভাল। দেহ মন একটু তাজা বোধ করলেই তার যে আশা

জাগে, সে যে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে নীরোগ নির্ভয় আনন্দময় জীবনের, এই মিথ্যা আশা মিথ্যা স্বপ্নকে বাতিল করে দিয়ে রোগের বোঝা বইতে বইতে জীবনটা কাটিয়ে দেবার জন্য নিশ্চিন্ত মনে প্রস্তুত হতে পারে।

কত মানুষ কত রোগের যাতনা সয়ে পঙ্গু হয়ে আরোগ্যের আশা ছেড়ে দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে। সেও নিজেকে তাদেরই একজন মনে করবে।

আরোগ্য লাভের জন্য আর ব্যাকুল হতে হবে না।

ভাবতে ভাবতে কেশবের মনে হয়, কমলকে যে স্পেশালিষ্টকে দিয়ে দেখানো হবে, সেও যদি তার শরণ নেয়?

তার অবশ্য মাথার ব্যারাম নয়। কিন্তু যে মাথা দিয়ে মানুষ জগতে এত কাণ্ড করছে, সূক্ষ্ম থেকে বিরাট সব কিছুই যে মাথার আয়ত্তে, সেই মাথা বিগড়ে গেলে তার বিশেষ চিকিৎসা যাকে শিখতে হয়েছে তার কি আর অন্যরকম রোগ সম্পর্কে জ্ঞান নেই? মাথার মত অঙ্গ, সে অঙ্গের চিকিৎসায় দেহযন্ত্র সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে কি স্পেশালিষ্টের চলে?

তার মাথাও ঘোরে—ঝিম ঝিম করে।

সঙ্কল্পটা ক্রমে ক্রমে মাথার মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে কেশবের।

কেশব বাড়ী ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে নিমাই এসে চাপা উত্তেজনার সঙ্গে জানায়, খবর জানো? বাবুর বড় জামাই পাগল হয়ে গেছে! বড় মেয়েকে দেখলেই নাকি কামড়াতে আসে—দিদিমনি তাই পালিয়ে এসেছে এখানে।

আসলে নিমাই এসেছে সিগারেট টানতে। সে এত বোকা ছেলে নয় যে কেশব কিছুই জানে না ধরে নিয়ে তাকে কমলের পাগল

হবার খবর জানাতে আসবে। আসল খবর এই যে কমল উঠেছে ভাড়াটে ফ্ল্যাটে, মলিনা এসে বাস করেছে এ বাড়ীতে।

তাকে দেখলেই কমল নাকি মরিয়া হয়ে ওঠে!

কেশব তাকে একটা সিগারেট দিয়ে বলে, দেশের জন্য তোর আর মন কাঁদে না, নারে নিমাই?

ঃ কাঁদে না? বাঃ!

ঃ বেশ তো ফুর্তিতে থাকিস দেখি।

ঃ কি করি বল? মন খারাপ করে লাভ কি? এবারও ধান ভাল হয় নি, তাতে আবার ধান কেটে নিয়ে গেছে। দেশে যাওয়া হবে না এখন।

ঃ তাই ফুর্তিতে আছিস!

ঃ ফুর্তি আবার কি দেখলে? মায়ের বলে চিঠি পাইনি একটা মাস। কিন্তু মন খারাপ করে রইলে আর লাভ কি হবে বল?

মোহিনীর হয়েছে ডবল নিম্যুনিয়া।

হয়েছিল সামান্য জ্বর। ভুবন তার জ্বরের জন্য ওষুধ আনতে গেছে, সেই ফাঁকে শরতের বাগানের গাছঢাকা ছায়াশীতল পুকুরে গায়ের জ্বালা কমাবার জন্য জ্বর গায়ে অনেকক্ষণ ডোবাডুবি করে ভিজে কাপড়ে হেঁটে বাড়ী ফেরার জন্য কিনা কে জানে!

জ্বরের জন্যই পুকুরের জলে গা জুড়োতে যাওয়া।

সেটা কি জ্বর ছিল?

মোহিনীর কিছু হলেই ভুবনেশ্বর কাবু হয়ে পড়ে। যথা-সর্বস্ব হারাবার ভয়ে মানুষ যেমন ভড়কে যায়।

লেভেল ক্রসিং-এর ওপর থেকে বেশী ভিজিটের ডাক্তার এনেছে। দিবারাত্রি ডাক্তারের নির্দেশমত ওষুধপত্র খাওয়াচ্ছে, সেবা করছে।

জরুরী চিঠি লিখেছে ভাই, খুড়ো আর ভগ্নীপতির কাছে। সাহায্য চাই, টাকার সাহায্য, সেবা-যত্ন দেখা শোনা করার সাহায্য।

বাড়ী ফেরার পথে খবর নিতে গিয়ে কেশব ভাখে, দরজায় দাঁড়িয়ে ভুবন মুখ বাঁকিয়ে বিড়ি টানছে।

ভুবন বলে, এই মাত্র ঘুমোলো।

বলে, একলাটি আর তো পেরে উঠছিনা ভাই। চিঠির একটা জবাব কেউ দিলে? টাকা না দিক—

ঃ টাকা চেয়েছিলে বুঝি ভুবনদা?

ঃ চিকিৎসার জন্য চেয়েছি। কোনদিন তো চাই না আজ হঠাৎ এমন বিপদ হল—

কেশব খোঁচা দেবার সুরে বলে, ওদেরও দোষ নেই ভুবনদা। কোন-দিন কোন সম্পর্ক রাখবে না, বিপদে পড়ে হঠাৎ সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখবে। হু'চার বছরের মধ্যে বৌঠানকে নিয়ে একবার দেখা করতে গিয়েছিলে কি? ওরা আছে না বিপদে পড়েছে খবর নিয়েছিলে কি?

ঃ সে যাই হোক, নিজের ভাই, বাপের ভাই, নিজের বোন—

ঃ না ভুবনদা, নিজের নয়। তুমি ভাবে থাকো, বোঝো না তো সংসারের ব্যাপারটা। আদান প্রদান না থাকলে কি আত্মীয়তা থাকে? তোমার চিঠি পেয়ে ওরা সবাই ভড়কে গেছে। ভাবছে, জবাব দিলেই কি হাঙ্গামায় পড়বে কে জানে! একটা বড় রকম ঝন্‌ঝাটে না পড়লে তুমি সাহায্য চেয়ে চিঠি লিখবে এটা ওরা ভাবতে পারছে না।

গোঙানির আওয়াজ শুনেই হু'জনে তাড়াতাড়ি ভেতরে যায়। মোহিনীর মাথায় বসানো আইস ব্যাগটা সরে গেছে।

কেশব বলে, ব্যাগটা একজনের মাথায় ধরে রাখতে হবে ভুবনদা।

ভুবন বলে, সারাদিন ধরেই তো আছি ভাই। কেউ তো এল না। একজন নার্শ রাখব ভাবছি। কিন্তু টাকা নেই, কি করি। বাড়ীটা বাঁধা দেব ভাবছি শরতের কাছে।

ললনা নানা সুরে গান গায়। মোহিনীর কাতরানির সুরটা একঘেয়ে, কিন্তু এমন ধারালো যে প্রাণের মধ্যে যেন কেটে কেটে বসে।

মোহিনী ছটফট করে, বিড়বিড় করে বকে যায়। কে দেখবে তার অপরূপ দেহের ছটফটানি, কে শুনবে তার বিকারের কথা ?

ভুবন হঠাৎ তাড়াতাড়ি আইস ব্যাগটা মোহিনীর মাথায় চেপে ধরে কিন্তু রাগে গা যেন জ্বলে যায় কেশবের।

বিকারের ঘোরে মোহিনী সিনেমার কথা বলছে! সিনেমা দেখতে যাওয়ার কথা নয়, সিনেমায় অভিনয় করতে যাওয়ায় কথা।

জড়ানো অস্পষ্ট হলেও মোহিনীর কথা মোটামুটি বুঝতে কষ্ট হয় না। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু'টি মনের কথাই সে জ্বরের ঘোরে প্রকাশ করছে।

আর সব কথা তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে।

একজন সারাদিনরাত ঘরে বসে তাকে পাহারা দেবে। কাজে বেরোবে না, পয়সা রোজগার করবে না, শুধু তাকে পাহারা দেবে! চারিদিকে পিঁপড়ে গিজ গিজ করছে কিনা তাই গুড়ের ভাঁড়টি পাহারা দেবে!

সিনেমায় ঢুকবেই সে এবার—কেন ঢুকবে না? শুধু একটা দিন চান করে এলো চুলে পুজোর থালা হাতে মন্দিরে যেতে হবে, সেজন্য কতগুলি টাকা দেবে বলেছে। পরে আরও কত ছবিতে নামাবে

বলছে। সারাদিন পাহারা দিয়ে তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখবে ভেবেছে একজন? এবার সে পালিয়ে গিয়ে সিনেমায় ঢুকবেই।

বজ্জাতটার সঙ্গে আর তো থাকবে না মরে গেলেও।

বিহ্বল ভুবনের ক্লিষ্ট কাতর মুখের দিকে চেয়ে কেশবের রাগও হয় হাসিও পায়—মায়া হয় না।

এবার ভুবন টের পেয়েছে যে বিয়ে করা বৌয়ের রূপকে পর্য্যন্ত শুধু পাহারা দিয়ে নিজের করে রাখা যায় না, তারও দাম দিতে হয়। মানুষ সমুদ্র পাহাড় মরুভূমি বনজঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজে আনে যা কিছুর দাম আছে। একটুকরো হীরের লোভে কত বড় বড় খনি খোঁড়ে। এমন অপরূপ দেহ মোহিনীর—আঁকা ছবিতে যে দেহের আশ্চর্য্য গঠন সৌন্দর্য্যে যৌবনের বিকাশ কৃত্রিম মনে হত, চোখ মেলে ত্থ'দণ্ড পর্দ্দার ছবিতে সেই জীবন্ত বাস্তব রূপ দেখে মানুষ খুসি হয়ে পয়সা দিতে প্রস্তুত।

উপযুক্ত মূল্য না দিয়েই এই রূপকে ঘরের কোনে নিজের করে রাখার সাধ্য যেন ভুবনের আছে!

এমন ভাবে পাহারা দিলেও সিনেমার ডাক ঠিক এসে পৌছে গেছে বন্দিনী মোহিনীর কাছে!

দিনরাত চোখে চোখে রাখে তবু কোন ফাঁকে মোহিনীর কাছে আহ্বান এসে গেছে—চলে এসো, নিজের দাম বুঝে নাও।

মোহিনীর ভাঙ্গাভাঙ্গা যে কয়েকটি কথা তার কানে গিয়েছে তার চেয়েও গভীর ভাবে সে ধরতে পেরেছে তার আসল তাৎপর্য্য।

কেশবের মনে পড়ে যায় পুরানো ব্যাপারটা। খুব বেশী পুরানো নয়, বছর দেড়েক আগের কথা।

কি সম্পর্কে ভাই হয় মোহিনীর, সিনেমা-জগতের সঙ্গে তার

সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সে এসে উস্কানি দিয়ে সিনেমায় অভিনয় করে নাম ও পয়সা রোজগারের জন্য ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল মোহিনীকে।

ভুবন চোখ কপালে তুলে বলেছিল, রাম রাম, ছি ছি, ভদ্রঘরের মেয়েরা ওখানে যায়?

মোহিনীর ভাই কড়া স্বরে বলেছিল, আমার বৌটা ভদ্রঘরের মেয়ে নয়।

ভালভাবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টাও সে করেছিল। সিনেমা-জগতটাকে কদর্য্য করে রাখা হয়েছ সত্যি কিন্তু সেটা শুধু মাতাল আর বেশ্যাদের জগৎ নয়। টাকার চেয়ে কিছুই বড় নয় সেখানে, মনুষ্যত্বের কেনাবেচা চলে। কিন্তু রূপ আর গুণেরও খানিকটা কদর আছে বৈকি?

কারিগর আর কাঁচামাল ছাড়া তো কিছুই তৈরী হয় না। যতই সস্তা করা হোক ছবি, যতই চেষ্টা চলুক সস্তায় রূপ আর গুণ ভাড়া করার, রূপসী আর গুণীদের বাদ দিয়ে ছবি তোলা কর্ত্তাদের সাধ্য নয়।

শুধু রূপও ওরা কেনে। রূপসী অভিনয় একেবারে না জানুক। ডায়ালগ বেশী নেই, অ্যাকসন বেশী নেই, রূপসী মেয়েটিকে এখানে ওখানে গুঁজে দিয়ে ছবি জমাবার সস্তা কায়দায় ওরা নিজেদের ওস্তাদ ভাবে।

তার বৌকে কেন নিয়েছে সিনেমায়?

তার বৌ হাসিখুসী সখির পার্ট খুব ভাল করতে পারে। তার বেশী সে কিছুই পারে না। শুধু নায়িকার হাসিখুসী সখি হওয়া! তিন ছেলের মা হল, তিন চার মাসের বাচ্চাটাকে তার হেফাজতে রেখে গিয়ে সে মহারাণীর চীফ সখির পার্টও করেছে।

বিগড়ে সে যায়নি? বরং তার অনেকগুলি ঘরোয়া দোষ কেটে গেছে।

প্রকৃতি রূপ দিয়েছে মোহিনীকে। মোহিনী যদি শক্ত হয়ে থাকে, তার রূপের সিনেমাটিক ছবিটুকু ছাড়া কিছুই বিক্রী করতে না চায়, কার সাধ্য আছে তাকে বিগড়ে দেবে?

ভুবন আর তর্ক করেনি। বয়োজ্যেষ্ঠ শালাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিল, খপরদার আমার বাড়ীতে আর এসো না। অপমান হবে।

ঃ আজকেই তো করলে চূড়ান্ত অপমান?

আকাশের বাঁকা চাঁদটার দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চোখ তুলে চেয়ে থেকে ভুবন বলেছিল, আবার এলে অপমান নয়, খুন করব।

সে আর আসেনি। কিন্তু সিনেমার ভাব ক্রমাগতই এসেছে মোহিনীর কাছে।

ভুবন টের পায়নি।

কি করে টের পাবে ভুবন? মোহিনীর জ্বরের জন্য ওষুধ আনতে ডাক্তারখানায় গেলে সেই ফাঁকে যে মোহিনী গায়ের জ্বালায় পুকুরে ডুব দিয়ে আসে, এটাও কি সে ভাবতে পেরেছে না জানতে পেরেছে।

ভুবন যেন কাতরভাবে কেশবের কাছে নালিশ জানায়, কোনদিন মুখ ফুটে কিছু বলবে না। কিছু চাইবেনা—

কিন্তু কেশবের সহানুভূতি মেলে না।

একি আর বলতে হয় ভুবনদা? কথায় আর যাই হোক পেট ভরে না।

ঃ কি জানি আমি এসব বুঝিনা ভাই। হিমসিম খেয়ে গেলাম।

বাড়ী ফিরে কেশব মিনুকে ডাকে।

ঃ ভুবনদা'র বৌয়ের অসুখ জানিস?

ঃ জানি না? তিনচার বার দেখে এসেছি।

: শুধু দেখে না এসে একটু সেবা যত্ন করলে ভাল হত। ভুবনদা একলা পারছে না।

মিনু মুখ বাঁকিয়ে বলে, তোমাদের হুকুম হলেই গিয়ে সেবা করতে পারি! সঙ্গে তো আবার একজন পাহারা দরকার হবে? আচ্ছা সে আমি ঠিক করে নেব, ভোলা নয় খুকুকে সঙ্গে নিলেই হবে।

মিনু নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। কেশব টের পায় তার নিজের কিছু বলার আছে।

তোমার মত না থাকলে এখানে হবে না, বুঝলে? ছোড়দাদের জানিয়ে দেব, আমি রাজী নই, গোলমাল করব। তোমার কথার দাম দেব না? একটা কিছু কারণ না থাকলে তুমি যেন এমনি অমত করছ।

বাড়ীতে তার মান বজায় থাকবে বোনের এই আশ্বাসে কেশব স্বস্তিও পায় না, বোনের কাছে কৃতজ্ঞতাও বোধ করে না। আগেই সে টের পেয়েছে যে তার কথার দাম না দেবার মতলব বাড়ীর লোকের নেই। সেদিন যতই জোর গলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে থাক পরে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেই সকলে চুপ হয়ে গেছে।

তার মনের ভাবটা ভাল করে বুঝে তবে ওরা এগোবে। তার অমত যদি খুবই জোরালো হয় তাহলে অগত্যা সেটা মেনে নিতেই হবে সকলকে —কিন্তু সেদিনের রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটির পর কেশবের চরম জিদ যদি খানিকটা নরম হয়ে থাকে, যদি টের পাওয়া যায় যে তার মতামত অগ্রাহ্য করলে খুব চটে যাওয়া ছাড়া সে বিশেষ কিছুই করবে না, তাহলে তার অমতেই মিনুর বিয়ে এখানে দেওয়া হবে।

কেশব খুসী হতে পারে নি।

এর চেয়ে সকলে তাকে অগ্রাহ্য করলেই যেন ভাল হত। রঞ্জনের

সঙ্গেই এরা মিনুর বিয়ে দেবে জেনে মায়ার সমস্যাটা জরুরী হয়ে উঠেছিল। মিনুর বিয়ের আগেই তাকে মনস্থির করে ফেলতে হত।

তারা দু'জনে স্বাধীন মানুষ, এ জগতে কারো কোন ক্ষতি না করে পরস্পরকে ভালবেসেছে। তাদের সম্পর্কের গোপনতা শুধু তাদেরই সুবিধার জন্য। কলঙ্কের ভয় তারা করে না। জানাজানি হলে তারা প্রকাশ্য ভাবেই একসঙ্গে বাস করবে। সম্ভব হলে আইনসঙ্গত ভাবে, সামাজিকভাবে।

সে স্বার্থপর হোক, সারা জীবনের জন্য মায়ার দায়িত্ব নিতে তেমন উৎসাহ বোধ না করুক, এ হিসাবে তার ফাঁকি নেই। ভাল লাগুক বা না লাগুক, জানাজানি হলে সে তো আর মায়াকে ফেলতে পারবে না।

কিন্তু রঞ্জনের সঙ্গে মিনুর বিয়ের প্রস্তাব কলঙ্কের প্রশ্নটা অন্য-দিক দিয়ে গুরুতর করে তোলে।

এখন জানাজানি হোক, কলঙ্ক রটুক, সে হবে শুধু তাদের দু'জনের কলঙ্ক, দু'বাড়ীর দু'টি মানুষের। তারা দু'জন বাড়ী থেকে বিদায় নিলেই চুকে গেল।

কিন্তু রঞ্জন আর মিনুর বিয়ে হলে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হবে দু'টি পরিবারের মধ্যে। কলঙ্ক তখন আর তাদের দু'জনের থাকবে না, তখন আঘাত গিয়ে লাগবে দু'টি পরিবারের গায়েই।

তারা দু'জন চিরকালের জন্য চলে গেলেও লাগবে।

অথচ এদিকে গোপনতা বজায় রাখতে বাধ্য হলেই, জানাজানি হওয়াকে ভয় করলেই তার আর মায়ার সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যাবে অন্যায়, অসঙ্গত।

তাই কি করবে না করবে তাকে ঠিক করে ফেলতেই হয় মিনুর বিয়ের কথা পাকা হবার আগেই।

কিন্তু আর সেটা জরুরী নয়। জোর গলায় সে না বললেই চাপা পড়ে যাবে রঞ্জনের সঙ্গে মিনুর বিয়ের প্রস্তাব।

এর চেয়ে সমস্যাটার মীমাংসা করে ফেলা জরুরী থাকাটাই যেন ভাল ছিল। বাধ্য হয়ে কি করবে না করবে তাকে ঠিক করতেই হত, অন্ত হত এই টাল বাহনার।

তাড়াহুড়ো না করলেও চলে, রঞ্জনের সঙ্গে মিনুর বিয়ে অবশ্যম্ভাবী নয়, এটা টের পাওয়া মাত্র তার মনে হয়েছে আগে তবে স্পেশালিষ্টকে দেখাবার হাঙ্গামাটা মিটিয়ে নেওয়া যাক, তারপর বিবেচনা করা যাবে মায়ার কথা!

মিনুর বিয়ে বলেই যেন তাদের একটা হেস্ত নেস্ত করে ফেলতে হবে শুনে মায়া বলেছিল, ধন্য মানুষ তুমি! সূক্ষ্ম তোমার বিচার। সংসারে মেয়ে বৌ যেন কেউ ঘর ছেড়ে যায় না, আমি প্রথম যাচ্ছি। আমরা চলে গেলে যা হবার হবে অত অত ভাবনা কিসের?

সত্যই কি সে বেশীরকম ভাবে, চিন্তায় অনাবশ্যক জটিলতা নিয়ে আসে? সে বাঁকা মানুষ তাই সহজভাবে পষ্টভাবে কিছু ভাবতেও পারে না, করতেও পারে না?

আট

দীর্ঘ জটিল পরীক্ষার পর স্পেশালিষ্ট ডাক্তার দত্ত তার অভিমত প্রকাশ করে।

কেশব সাগ্রহে ললনাকে জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তার কি বললেন? ললনা হঠাৎ চটে যায়।

ঃ তা জেনে আপনার দরকার কি?

ঃ না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। সেরে যাবে তো ?

ঃ সারবে বৈকি।

কিন্তু বাড়ীর ড্রাইভারের কাছে কি আর গোপন থাকে বাড়ীর জামায়ের রোগ সম্বন্ধে স্পেশালিষ্ট ডাক্তার কি বলেছে সেই খবর।

বংশগত কারণে কমল পাগল হয়েছে এটা একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে ডাক্তার দত্ত। উন্মাদ রোগের ঝোঁক একটু থাকতে পারে এই বংশে, তার বেশী কিছু নয়। রোগের আসল কারণ ছিল কমলেরই নিজের জীবনে এবং নিজের দেহে।

সাধারণ হিসাবে লজ্জাকর কারণ। অন্তত দেহগত কারণটা। দেহের বিকার আর জীবন যে সম্পর্কহীন নয় মানুষের।

কমলের বাবা যে চিকিৎসায় সেরেছিল সে চিকিৎসায় কুলোবে না। ডাক্তার দত্তকে দিয়েই চিকিৎসা করানো দরকার।

প্রণব মত দিয়েছে কিন্তু কমলের মা আর কাকা বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

তারা বলে, এসব হল ডাক্তারের চালাকি। একরাশি টাকাই শুধু খরচ হবে, ফল পাওয়া যাবে না কিছুই। এ রোগের কি দ্বিতীয় চিকিৎসা আছে ? বংশানুক্রমে পরীক্ষিত সুনিশ্চিত চিকিৎসা থাকতে একজন স্পেশালিষ্ট বলছে বলেই অন্ধকারে এগিয়ে চলার কোন মানে হয় ?

ডাক্তার দত্তের চিকিৎসা চললে তারা সহায়তা করবে না !

এখন মলিনা যা বলে।

মলিনাকে দেখলেই কমল অবশ্য উগ্র হয়ে কামড়াতে যায়, তবু সে তার বিবাহিতা স্ত্রী। কমলের টাকা পয়সা সব তারই হেফাজতে আছে। তিন বছরের ছেলেটাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে মলিনা বলে,

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা বাবা। তবু মলিনাকে তাজা মনে হয়। মুখে সে বলে বটে যে কিছুই বুঝতে পারছে না, মনে মনে কিন্তু সে ডাক্তার দত্তের উপর নির্ভর করতেই ইচ্ছুক।

ডাক্তার দত্তের কল্যাণে সে একটা স্থায়ী দুঃস্বপ্নের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। বংশগত রোগ নয়! ছেলেকেও তার বড় হয়ে একবার পাগল হতে হবে এটা ভাগ্যের অনিবার্য্য নির্দ্দেশ নয়! মলিনা যেন অনেক শান্তি পেয়েছে।

অনিমেষ বলে, কিন্তু তোমাকেই শেষ কথা বলতে হবে।

মলিনা চিন্তিতমুখে বলে ডাক্তার দত্ত যখন বলছেন স্পেশালিষ্ট দরকার, আমার তো মনে হয়—

অনিমেষ বলে, আমিও তাই বলছি।

ডাক্তার দত্তকে দিয়ে নিজের পরীক্ষা করানোর জন্য এবার কেশব উদগ্রীব হয়ে পড়ে। একজন কেন পাগল হয়েছে যদি ঠিক ভাবে ধরতে পারে ডাক্তার দত্ত, তার অসুখটা নিশ্চয় অনায়াসে ধরে ফেলবে।

অনিমেষের কাছে যে একখানা পরিচয় পত্রের আবেদন জানায়।

ঃ তোমার আবার কি হল?

ঃ মাথার যন্ত্রণা, রাতে ঘুম হয় না—

অনিমেষ চমৎকৃত হয়ে বলে, সেজন্য এত বড় স্পেশালিষ্টকে দেখাবে? ওর ফি কত জানো?

কেশব বলে জানি বৈকি! দেখি যদি একটু কমটম করেন। সাধারণ ডাক্তারের চিকিৎসায় কিছু হল না। ভয় হচ্ছে, যদি পাগল হয়ে যাই! টাকার মায়া করে কি হবে বলুন! যথা সর্ব্বস্ব যায় যাবে, অসুখটা যদি সারে—

পরিচয় পত্র লিখতে লিখতে অনিমেষ কয়েকবার মুখ তুলে তার দিকে চায়। মাথায় ছিট আছে সন্দেহ নেই, নইলে এই যোয়ান মদ্দ সুস্থ সবল মানুষটা মাথা ধরে আর ঘুম হয় না বলে স্পেশালিষ্টকে দেখাতে চায়। একটা বিয়ে করলেই তো সব সেরে যায়।

ড্রাইভারকে সোজাসোজি বিয়ের কথাটা বলতে সঙ্কোচ হয় অনিমেষের, সে একটু ঘুরিয়ে বলে, আমারও এরকম হয়েছিল। তোমার চেয়ে কম বয়সে। মাথা ঘুরত, ঘুম হত না। তারপর চাকরী নিলাম বিয়ে করলাম, আপনা থেকে সব সেরে গেল।

সেরে গেল? মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করে ওঠে অনিমেষের, কিছুদিনের জন্য সেরে গিয়েছিল বটে—কিন্তু তারপর মাঝে মাঝে মাথা কি তার ঘোরে নি, ঘুমের জন্য ছটফট্ করে নি? পদোন্নতি হওয়ার পর জামাই পাগল হবার পর আবার কি মাথাটা তার বেশী করে ঘোরে না, ঘুমের জন্য সারারাত ছটফট করে না?

কেশব বলে, আমার অসুখটা আরও কঠিন। ডাক্তাররা ধরতেই পারলে না কি হয়েছে!

নিশ্বাস ফেলে অনিমেষ বলে ছুটি নেবে তো চিকিৎসার জন্য?

ঃ কয়েকদিনের ছুটি যদি দ্যান—

অনিমেষ গম্ভীর হয়ে বলে, দ্যাখো স্পেশালিষ্ট দেখাচ্ছো, ট্রিটমেণ্ট দু'চার দিনের ব্যাপার হবে না। আমাকে আবার নতুন ড্রাইভার রাখার হাঙ্গামা করতে হয়। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক—

কেশব প্রতীক্ষা করে।

ঃ কি জান, আমি আর ড্রাইভার রাখবই না ভাবছিলাম, নিজেই ড্রাইভ করব। তোমাকে একেবারে বিদেয় দিতে মন চায় না।

একটু সম্পর্ক বজায় থাক। তুমি রোজ শুধু আমাকে আপিসে পৌছে দেবে আর আপিস থেকে ফিরিয়ে আনবে। তোমার আর কোন ডিউটি থাকবে না! পারবে?

ঃ পারব।

ঃ আজ মাসের মোটে সতের তারিখ। তা হোক, এ মাসটা তোমায় ছুটি দিয়েছি ধরব। শুধু আপিসে পৌছে দেবে নিয়ে আসবে তবু এমাসের পুরো মাইনেটাই পাবে। সামনের মাস থেকে মাইনেটা এ্যাডজাষ্ট করে নেওয়া যাবে, কেমন?

পদোন্নতি হয়েছে, আয় পড়ে গেছে ধপাস করে, কতদিকে খরচ কমেছে, কেষ্ট বিদায় হয়েছে নিমাই নোটিশ পেয়েছে, তাকে কেন বহাল রেখেছে অনিমেষ—এই কথাই কিছুদিন থেকে ভাবছিল কেশব। প্রত্যাশাও করছিল বরখাস্তের হুকুমের।

কিন্তু নিজে গাড়ী চালিয়ে আপিস গেলে মান থাকে না অনিমেষের। ড্রাইভার চালিত গাড়িতে বসে সিগার টানতে টানতে অন্ততঃ আপিস যাওয়া আর আপিস থেকে বাড়ী ফেরাটা তাকে বজায় রাখতেই হবে আপিস করার অঙ্গ হিসাবে।

কিভাবে কথাটা তাকে বলবে ভাবছিল অনিমেষ। আজ সুযোগ পেয়েই পাকা ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কেশব বুঝতে পারে।

পরিচয় পত্রখানা তার হাতে দিয়ে অনিমেষ বলে, নতুন ব্যবস্থায় তোমার কোন ক্ষতি নেই, তুমি ফ্রি থাকবে সারাদিন, অন্য কাজ করতে পারবে। আমিই ব্যবস্থা করে দেব। আমাকে আপিসে পৌছে দিয়ে তুমি সেই কাজে চলে যাবে, দরকার সময় আমাকে তুলে নিয়ে আসবে। মোটামুটি দেখো, উপার্জ্জন তোমার বেশী হবে।

কেশবের হাত ঘড়ির হিসাবে পুরো তু'ঘণ্টা তেরো মিনিট পরে ডাক্তার দত্ত তাকে কামরায় ডাকে—অনিমেষের লেখা পরিচয় পত্রটী পাঠানো সত্বেও।

কেশবের মনে হয়, পরিচয় পত্র না এনে সোজাসুজি নিজে এসে ধন্না দিলেই বোধ হয় ভাল করত!

ডাক্তার দত্ত হাসিমুখে বলে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি? উপায় নেই। দিন দিন রোগীর ভিড় বাড়ছে, আর পেরে উঠছি না আমি।

ডাক্তার দত্তের রকম দেখে আর মুখের ভাব দেখে কেশব আশা ছেড়ে দেয়। রোগীর ভিড়ে ডাক্তার বিহ্বল হয়ে গেছে। বিশেষ রোগী হিসবে তার বিশেষ চিকিৎসা কি এর দ্বারা সম্ভব হবে?

ডাক্তার দত্ত ক্লান্ত শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করে, ব্যাপারটা কি? বসুন। রোগীর চেয়ারে বসতে না বলে আপনাকে অন্য চেয়ারে বসতে বলা উচিত ছিল। আজ পর্য্যন্ত আপনার মত সুস্থ সবল রোগী আমার চেম্বারে আসে নি।

কেশব বিনীতভাবে বলে, আপনার যদি আজ সময় না থাকে—

ডাক্তার দত্ত ক্লান্ত মুখে হাসি এনে বলে, আপনি কতক্ষণ সময় আমাকে দিতে পারেন আর আমি কতক্ষণ সময় আপনাকে দিতে পারি পরীক্ষা হোক না? সাতটায় এ চেয়ারে বসেছি, এগারোটা বাজে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নয় বসব আপনার জন্য। আপনি পারবেন তো?

হঠাৎ খুসীর যেন সীমা থাকে না কেশবের!

সে টের পায় ডাক্তার দত্ত তার চিকিৎসা সুরু করে দিয়েছে! নইলে সামান্য একটা ড্রাইভার রোগীর জন্য এতবড় স্পেশালিষ্ট ডাক্তার এমন বক্ বক্ সুরু করে?

ডাক্তার দত্ত মেরুদণ্ড সোজা করে হাই পাওয়ার চশমায় স্থির

দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে বলে, কোন রোগ নেই, তবু কত লোক যে আমায় শুধু টাকা দেবার জন্য আসে! আবার রোগী হলেও টাকা দিয়ে আমায় যেন কিনে নিয়েছে এমনি ভাবে ফিরিস্তি পেশ করে, আমার এই অসুখ, ওই অসুখ। দশ বিশ বছরের অসুখ, কিন্তু আশা করি রাতারাতি আমি সারিয়ে দেব। এতগুলি টাকা দিলে আমি এত বড় ডাক্তার, রাতারাতি দশ বিশ বছরের পুরানো রোগ না সারাতে পারলে আমি আছি কি জন্য?

কেশব সত্যিই ভড়কে যায়!

জগতে জটিল রোগ আছে বলেই প্রতিদিন নিরুপায় রোগী এক কাঁড়ি টাকা এসব স্পেশালিষ্টদের পায়ের কাছে ফেলে দেয়। রোগীকে এদের গ্রাহ্য না করারই কথা। অথচ তাকে রোগীর চেয়ারে বসিয়ে ডাক্তার দত্ত রোগের বিবরণ শোনার বদলে নিজের কথা বলতে আরম্ভ করেছে—ডাক্তারকে কত খাটতে হয়, রোগীরা কেমন অবুঝ, রোগ সারানো কত কঠিন কাজ!

কুড়ি বাইশ বছরের একটি মেয়ে এককাপ ঘোলাটে রঙীন কি একটা পানীয় এনে টেবিলে রেখে প্রশ্ন করে, আজও পারবে না তো?

ডাক্তার দত্ত মাথা নাড়ে।

মেয়েটি রুষ্ট মুখে বলে, তবে আর দরকার নেই।

বলে গট গট করে ভেতরে চলে যায়।

ডাক্তার দত্ত হাসিমুখে কেশবের দিকে চেয়ে বলে, দেখলে তো? রোগীও দেখব আবার ঘরের লোকের ফরমাস না শুনলে তারাও চটবে! সবাই যেন পেয়ে বসেছে আমায়।

আরও প্রায় আধঘণ্টা এমনি ভাবে এলোমেলো কথাবার্তা চালিয়ে

ডাক্তার দত্ত সেদিনকার মত কেশবকে বিদায় দেয়। বুকে ষ্টেথস্কোপটা পর্য্যন্ত লাগায় না।

: রোগটা দেখলেন না ?

: না, আজ কেবল রোগীকে দেখলাম। রোগীকে না বুঝলে রোগ বুঝব কি করে ?

কেশব স্বস্তি পায়। কৃতজ্ঞতা বোধ করে। হঠাৎ যেন আশার গুঞ্জন শোনে। না, এ ডাক্তার সত্যি খুব ভাল। গোড়াতেই ঠিক ধরেছে তার রোগের একেবারে আসল কথাটি।

রোগটা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে তার জীবনে, তাকে ভাল করে না জানলে রোগ যে ধরা যাবে না, এটা অনুমান করতে দেরী হয় নি।

ডাক্তার-পরীক্ষার রিপোর্টগুলি নিয়ে পরদিন আবার তাকে যেতে বলা হয়।

পরদিন রিপোর্টগুলি দেখতে দেখতে ডাক্তার দত্ত বলে, বাঃ, এ তো অর্দ্ধেক কাজ এগিয়ে আছে !

পরীক্ষা ও চিকিৎসা মোটামুটি কি ভাবে কতদিন চলবে, খরচ কতদূর গড়াতে পারে এসব বিষয়ে সেদিন কথা হয়।

ডাক্তার দত্ত বলে, তোমার কি অসুখ হয়েছে বলা কঠিন হবে না। কিন্তু আসল কথা হল কেন হয়েছে বার করা।

আরেকটি কথা খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলা হয় কেশবকে। ডাক্তারের কাছে কোন কথা গোপন করলে চলবে না—তার নিজের জীবনের কথা। খোলাখুলি সব জানাতে হবে।

ডাক্তার অবশ্য রোগীর সব গোপন কথা শোনে শুধু চিকিৎসার জন্য, ভাল মন্দ বিচারও করে না, ওসব কথা মনে করেও রাখে না।

: কথাটা ভাল করে ভেবে ভাখো।

খোলাখুলি সব বলতে পারবে না যদি মনে কর, তা হলে আর এগোনোই ভাল। তোমার কতগুলি টাকা আর আমার সময় শুধু হবে। তার চেয়ে বরং টাকাগুলো সব আমায় দিয়ে চলে যাও—ক কথাই দাঁড়াবে।

গোপনীয় কি আছে তার জীবনে ডাক্তার দত্তকে যা জানানো র না? এমন কোন পাপ তো সে করে নি কখন ডাক্তারকেও বলা যায় না।

শুধু এক মায়ার কথা। মায়ার কথা জানাতে তার আপত্তি কি? যার নামধাম পরিচয় নিশ্চয় ডাক্তার দত্তের দরকার হবে না!

সে সরল ভাবে বলে দেখুন একজনের সঙ্গে আমার গোপনে লবাসা আছে—একটি বিধবার সঙ্গে। নাম ঠিকানা বলতে হবে না গা?

না না, নাম ঠিকানা আমার দরকার নেই। ভালবাসাটা কি কমের পরে সেটা একটু জানালেই হবে—আমি প্রশ্ন করব তুমি বাব দেবে। আরও অনেক কথা জানতে হবে।

কেশব বিব্রতভাবে বলে, গোপনীয় আর কিছু নেই। কিন্তু আর কটা কথা বলি। এই ভালবাসার ব্যাপারটার জন্ত কিন্তু আমার সুখ নয়। এটা অনেক পরে ঘটেছে।

ডাক্তার দত্ত সায় দিয়ে বলে, আমিও তাই বলছি। আগে সুখ, পরে ভালবাসা। কাজেই তোমার ভালবাসাটা কি রকম াই থেকে রোগের লক্ষণ জানা যাবে।

কেশব ভাবে, কি সর্ব্বনাশ! মায়ার সঙ্গে তার ভালবাসা তার রাগেরই একটা লক্ষণ নাকি? একবার ভাবে সোজাসুজি কথাটা

জিজ্ঞাসা করে। আবার ভাবে, এরকম প্রশ্ন কি করা চলে ডাক্তারকে?

ডাক্তার দত্ত বলে, কথাটা গোলমেলে লাগছে? আচ্ছা এই পয়েণ্টটা নিয়েই আমাদের কাজ সুরু করা যাক। ভালবাসা থেকে অসুখের লক্ষণ কি ভাবে বার করা যায়? ভালবাসার ওপরেও অসুখটার প্রভাব থাকায় কতগুলি পিকুল্যারিটিজ এনে দেয় কাজেই ওগুলি অসুখেরই লক্ষণ। ওইগুলি বিচার করলে—

সেদিন দু'টী চিন্তা মাথা জুড়ে থাকে কেশবের।

টাকার চিন্তা আর প্রেমের রহস্যের চিন্তা।

একটী পয়সা কখনো জমাবার চেষ্টা করে নি, নিজের খরচ বাদে সব টাকা বাড়ীর লোকের পিছনে খরচ করেছে। আজ এত দরকারী চিকিৎসার টাকা তার হাতে নেই!

বাড়ীটা বাঁধা রাখতে হবে কিম্বা বেচে দিতে হবে। কে জানে। কি হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে বাড়ীর সকলে। এমন একজন বন্ধু পর্য্যন্ত তার নেই যার কাছে কিছু টাকা ধার করতে পারে। বন্ধু তার শুধু কানু, ধার দেবার মত টাকা কানুর নেই।

ভাল হয়ে যাবার আশা আরও জোরদার হয়ে উঠেছে আজ। মনে এসেছে দ্বিধাহীন সঙ্কল্প, চিকিৎসা শেষ পর্য্যন্ত সে চালিয়ে যাবেই। বাড়ীর সকলে যতই রাগ করুক যতই চেঁচাক, দরকার হলে বাড়ী সে বিক্রী করবে।

নিজের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তায় কেশব আশ্চর্য্য হয়ে যায়। এমন গুরুতর বিষয়ে এমন অনায়াসে মনস্থির করে ফেলা তো তার নিয়ম নয়!

ডাক্তার দত্ত বলে দেয় নি কিন্তু আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর থেকে কেশবের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কথাটা যে তার প্রেমটা গোপন বলে,

গভীর রাত্রে চুপি চুপি গিয়ে মিলিত হবার রোমাঞ্চ আছে বলে সে মায়াকে ভালবাসে! এটা না থাকলে তার বুকে ভালবাসা জাগত না, এর অভাব ঘটলে তার ভালবাসা নির্জীব হয়ে যাবে।

মায়াকে নিয়ে স্বামীস্ত্রীর মত ঘর বাঁধতে এইজন্য তার উৎসাহ জাগে না!

ভাসাভাসা ভাবে এই সত্যের ইঙ্গিতে আগেও তার মনে এসেছে।

কিন্তু কেশব সন্তুষ্ট হতে পারে না। শুধু এইটুকুই কি তার প্রেমের রহস্য?

মনে হয়, এ শুধু আংশিক সত্য। আরও গভীর কিছু আছে তার ভালবাসায়, আরও বড় সত্য আছে।

কেন তার মনটা এমন হল, সে প্রশ্ন নয়। সে প্রশ্নের জবাব আবিষ্কার করতে আরও সময় লাগবে ডাক্তার দত্তের।

যে কারণেই রাত্রির গোপনতায় রোমাঞ্চকর অসামাজিক প্রেমে তার রুচি জন্মে থাক, সেটাই সব কথা নয়। মোহিনীর সঙ্গে ভালবাসার খেলায় ঢের বেশী রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার প্রতিশ্রুতি ছিল। মায়ার সঙ্গে ভাব হবার আগে মোহিনীর তীব্র আকর্ষণে নিজের রোগের যাতনা পর্য্যন্ত সে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। তবু তো মোহিনী চেষ্টা করেও তার মন পায় নি।

মোহিনীর স্বামী আছে বলে? পাপপুণ্য না হোক, ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিতের বিচার তার আছে বলে? নীতিজ্ঞান?

কেশব জানে না। তাই যদি হয় তবে সেটাও তো প্রমাণ যে ওই রোমাঞ্চটাই তার কাছে সব নয়, যথেষ্ট নয়!

আরও কিছু সে নিশ্চয় পেয়েছে মায়ার কাছে, আরও বড় কিছু। নইলে তার ভালবাসা পাওয়ার ভাগ্য মায়ার হত না!

নয়

বাড়ীটা বাঁধা রেখেই কেশব টাকা যোগাড় করে।

বাড়ীতে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। কিন্তু সে গ্রাহ্যও ক
না। বিশেষ বিচলিতও হয় না।

বাড়ীর মানুষ তর্ক করতে চায়, ঝগড়া করতে চায়, রাগারা
করতে চায়, কিন্তু তাকে বাগাতে পারে না। কথনো ধৈর্য্য
চুপচাপ তাদের কথা শুনে, কথনো ধমক দিয়ে আবার কথনো সোজ
সুজি স্থান ত্যাগ করে সে তাদের সঙ্গে সংঘাত যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে

আরোগ্য লাভের জোরালো আশাই মনে তার আশ্চর্য্যরকম জো
এনে দিয়েছে।

মায়া বলেছিল, আমার দুটো গয়না লুকানো আছে। নেবে?

: না।

মোহিনার অসুখ সেরেছে কিন্তু এখনো সে বিছানা ছাড়েনি
রোগে ভুগে একটা অদ্ভুত কমনীয়তা এসেছে তার রূপে।

আগেকার ছেলেটীর সঙ্গেই মিনুর বিয়ে দেওয়া হবে স্থির হও
গোবিন্দ চটে গিয়ে ভাংচি দিয়ে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়েছে।

রঞ্জনের সঙ্গে তার বিয়ে দেবার সাধটা আবার প্রবল হয়ে উঠে
সকলের মধ্যে।

কানুর বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। বেলা একদিন সকা
বেড়াতে এসে কেশবকে বলে, তোমার বন্ধুটি একনম্বরের ইয়ে কেশব
কিছু নেবে না নেবে না শেষ পর্য্যন্ত ঘাড়টী মটকেছে। বাবা দ
দু'জনকেই দেনা করতে হল।

: এমনিই দেনা করতে হচ্ছে মানুষকে, একটা মেয়ের বিয়ের
করতে হবে না?

নিমাই একটা কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। কাছেই একটা ময়রার দোকানে।

ঃ খুব খাবার খাবি মজা করে?

ঃ নাঃ, সিনেমা দেখব।

কেশব নতুন কাজ খুঁজছিল, অনিমেষকে আপিসে পৌছে দিয়ে ফিরিয়ে আনার সামান্য পয়সায় তার চলবে কেন। দেনাও শোধ দিতে হবে।

কানু বলে, বাস চালাবি?

ঃ পারব? সহ্য হবে?

কানু চটে বলে, সহ্য হবে? যোয়ান মদ্দ মানুষ তুই, বলতে লজ্জা করে না? কিছুদিন শিখতে হবে, বাস। ভাল রোজগার।

বলে, তাছাড়া, বাস চালালে তোর ওই হিষ্টিরিয়া ভাবটা সেরে যাবে। ব্যাটা ছেলে দু'চুমুক মদ খেতে ভয় পায়!

হিষ্টি'·

ডাক্তার দত্তও তার অসুখের নাম বলেছে কি একটা যেন হিষ্টিরিয়া। মেয়েদের যে হিষ্টিরিয়া হয় সেরকম নয়।

শুনে কেশব বলেছিল, সে কি স্যার, হিষ্টিরিয়া তো মেয়েদের হয়?

ঃ পুরুষের হয় না? মেয়েদের তুলনায় তোমরা মহাপুরুষ বলে? তোমার অসুখের এটা একটা বড় লক্ষণ—মেয়েদের তুমি খুব হীন ভাব। মেয়ে জাতটার সম্পর্কেই তোমার একটা দারুণ ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা আছে। এটা তোমার অসুখের কারণও হতে পারে।

এখন ঠিক বলতে পারছি না, এ ভাবটা তোমার কোথা থেকে এল কেন এল খুঁজছি।

কেশব হতভম্ব হয়ে বসে থাকে।

কানুও তার হিষ্টিরিয়ার ভাবের কথা বলেছিল। বলেছিল অবশ্য

দু'চুমুক মদ খেতে তার আতঙ্কের নিন্দা করে, কিন্তু অন্যান্য আরও সব লক্ষণ হয় তো তার চোখে পড়েছে।

এমনিতে কানুর মত সাধারণ একজন মিস্ত্রীর পর্য্যন্ত যা মনে হয়েছে, এতবড় একটা স্পেশালিষ্ট ডাক্তারের কাছে সেটা ধরা পড়ে যাবে বৈকি।

কিন্তু হিষ্টিরিয়া?

সে কাতরভাবে বলে, তাহলে ওই যে মাথা ঘোরে বুক ধরফড় করে ঘুম হয় না—ওসব আমি ভাণ করি বলছেন সার?

ডাক্তার দত্ত হাসিমুখে বলে, তা কেন বলব? ওগুলি তোমার অসুখের লক্ষণ। নিউরেসথেনিয়ায়—মানে স্নায়বিক দুর্ব্বলতাতেও এসব লক্ষণ হয় বটে কিন্তু মুখ দেখেই বলে দেওয়া যায় তোমার নার্ভস মোটেই উইক নয়। হিষ্টিরিয়ার রোগের ভাণ করে, কিন্তু তোমার সেটা নেই। এই অসুখটারও রকমফের আছে তো, রোগী আর কারণের ওপর সেটা নির্ভর করে।

তবু যেন কেশব মানতে পারে না তার হিষ্টিরিয়া হয়েছে। ন্যাকা মেয়েদের যে রোগ হয়।

সে বলে, কিন্তু আমি তো কোনরকম পাগলামি করি না সার? পাড়ার একটি বৌয়ের হিষ্টিরিয়া আছে, মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে—

ডাক্তার দত্ত বাধা দিয়ে বলে, বৌটির সঙ্গে তোমার তফাৎটা ভুলো না। সে হেসে কেঁদে গড়াগড়ি দিয়ে পাগলামি করে, তুমি অন্যভাবে কর।

: করি সার?

: নিশ্চয় কর।

: সেরে যাব তো?

: নিশ্চয় সেরে যাবে। তোমার অসুখের ব্যাপারটা মোটামুটি

বুঝে গিয়েছি। এবার চিকিৎসা আরম্ভ হবে। এটা মনের অসুখ তাই তোমার চিকিৎসাটাও হবে মানসিক।

কেশব প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, কিন্তু আমার তো কাব্যিরোগ নেই স্যার? বরং রসকষ খুব কম। গাড়ী হাঁকাই, রোগটার কষ্ট আছে—

ডাক্তার দত্ত হেসে বলে, কাজেই তুমি নীরস কাঠখোট্টা মানুষ হয়ে গেছ? একেবারে চাঁচাছোলা বস্তুবাদী? এইখানেই হয়েছে তোমার মুস্কিল। নিজেকে বোঝো না, কিন্তু তেজের সঙ্গে সেটা তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে পার। তুমি জেনে রেখেছ রসিক ভাবুক মানুষরা কথায় কথায় হেসে কেঁদে আকুল হয়, ভাবাবেগে গদগদ হয়ে থাকে। কাব্যিরোগ বলতে তুমি বোঝো ছ্যাবলামি, ন্যাকামি। তুমি ভাব যেহেতু তুমি সব সময় সব বিষয়ে সিরিয়াস, কাজেই কাব্যিরোগ তোমার হতেই পারে না।

কেশব চুপ করে থাকে।

ঃ কিন্তু সিরিয়াসলি নিয়েছ বলেই কি তোমার অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা আর ইচ্ছাগুলি বাস্তব হবে, সম্ভব হবে? তুমি যে মেয়েলি হিষ্টিরিয়া দেখেছ, তোমার কাছে ছ্যাবলামি পাগলামি ঠেকলেও তারা নিজেদের কাছে কি কম সিরিয়াস? ভাব তো কতখানি সিরিয়াসলি নিলে মানসিক ভুল ধারণা দেহের ক্রিয়াকে কণ্ট্রোল করতে পারে? একটু দরদের জন্য কত রকম উদ্ভট কাণ্ড করে, তোমার কাছে ওই ফাঁকা দরদের কোন দাম নেই। দরদের লোভে রোগের ভাণ করার কথা তুমি ভাবতেও পার না। জেগে থেকে হাল্কা মিষ্টি স্বপ্নের জাল বোনা তোমার আসে না, ওরকম কাব্যি রোগকে তুমি ঘেন্না কর। বেশ কথা। কিন্তু তুমি যে দুটো জগৎকে জয় করতে চাও ভোগ করতে

চাও, দু'রকম দুটো জীবনকে একসঙ্গে আঁকড়ে থাকতে চাও—এটাকে কি বলব? এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়ে তুমি যে মিথ্যা কল্পনার জাল বুনে চল, সেটাকে কি বলব? ভুল ধারণা বাঁকা কামনা থেকে যদি মেয়েলি হিষ্টিরিয়া হয়, তোমার ভুল ধারণা অসম্ভব ইচ্ছা থাকলেও তুমি রেহাই পাবে কেন?

ঃ বুঝলাম না সার।

ঃ আজ বুঝিয়ে বলছি, আবার বুঝিয়ে বলব, তোমাকে বুঝতেই হবে। তাছাড়া তোমার আর কোন চিকিৎসা নেই।

ঃ একথাও বুঝলাম না সার।

ঃ একথাটাও বুঝতে কষ্ট হবে না। তোমার অসুখের চিকিৎসায় ওষুধপত্র লাগবে না। তোমার ভাষাতেই বলি, মেয়েলি হিষ্টিরিয়া হলে ওষুধপত্র কাজে লাগে, তোমার বেলা দরকার লাগবে না। তোমার ব্যাপারটা তোমায় বুঝিয়ে দেওয়াই তোমার একমাত্র চিকিৎসা। আমি এত এতদিন বুঝবার চেষ্টা করে এসেছি, এখনো খুঁটিনাটি অনেক কিছু আমারও বুঝতে বাকী আছে। তবে মোটামুটি যা বুঝেছি তাতে এবার আসল চিকিৎসা সুরু করে দেওয়া যেতে পারে। আসল চিকিৎসাটা হল তোমায় বোঝানো, তোমার কতগুলি ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেওয়া।

কেশব নীরবে চেয়ে থাকে।

ডাক্তার দত্তকে কয়েক মুহূর্তের জন্য আনমনা মনে হয়। কেশব টের পায় ডাক্তার দত্ত তাকে বোঝাবার উপযুক্ত সহজ ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ গভীর ভাবে ডাক্তার দত্ত চিন্তা করে, কেশব টুঁ শব্দটি করে না, নড়া চড়া করে না। ডাক্তার দত্তের চিন্তাটা তারই আরোগ্যের জন্য।

: ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেওয়ার মানেটা গোড়ায় ভাল করে বুঝে নেও। তোমার আমার মন হল হরেক রকম ভুলের গুদাম। কতরকমের ধারণা বিশ্বাস সংস্কারে যে ঠাসা হয়ে আছে বলা যায় না। আমি কিন্তু তোমার মনের ভুলের গুদামটা সাফ করার চেষ্টা করব না। সে ক্ষমতা আমার নেই। আমি তোমায় কিছুই শেখাব না। অন্যগুলি বাদ দিয়ে আমি শুধু তোমার মনের কয়েকটা বিশেষ বিশেষ গলদ বেছে নেব, তোমার অসুখটার জন্য যেগুলি দায়ী।

কেশব চেয়ে থাকে।

: আসল গলদটা হল ওই—আগে যা বলেছিলাম। যা আছে ; যা পাওয়া সম্ভব, তুমি তাতে সন্তুষ্ট নও। প্রায় বিপরীত দু'রকম জীবন তুমি একসঙ্গে চাও—তার মানেই দাঁড়ায়, দুদিকে তোমার যেমন টান তেমনি আবার বিতৃষ্ণা। তুমি দু'রকম জীবন চাও কিন্তু পুরোপুরি চাও না। একদিকে টান বেশী হলে তুমি সেইদিকে ভিড়ে পড়তে, একেবারে সন্তুষ্ট না হলেও ভাল লাগা মন্দ লাগা মেশাল দিয়ে মোটামুটি দিন কাটত—হিষ্টিরিয়া জন্মাত না। কিন্তু তোমার মুস্কিল হল ওইখানে। তুমি যত জোরের সঙ্গে এটা ওটা দুটোই চাও—তেমনি জোরের সঙ্গে দুটোকেই অপছন্দ কর। সেকেলে ঘরোয়া ভাব, স্নেহ ভালবাসা, নিজের কথা ভুলে গিয়ে মেয়েদের তোমার পায়ে নিজেকে সঁপে দেওনা—এসব তোমার চাই, একেবারে ছাঁকা খাঁটি জিনিষটি চাই। ওই বিধবাটির সঙ্গে তাই তোমার ভালবাসা হয়। কিন্তু তুমি যে ছাঁকা খাঁটি জিনিষগুলি চাও সে রকম কিছু তো আর সংসারে পাবার নয়—ওটা নিছক তোমার কল্পনার জিনিষ। কাজেই বাস্তবে যা পাও তাতে তোমার মন ওঠে না, রাগ হয়, বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। ভালবেসেও বিধবাটি তোমার কাছে তুচ্ছ

ফেলনা মানুষ হয়ে থাকে—তুমি যা চাও দিতে পারে না বলে তোমার রাগ হয়, বিতৃষ্ণা জন্মে যায়। দরদ ভালবাসা সস্তা মেকি মনে হয়। এদিকে তোমার আবার সহরের দিকে টান। সহুরে মেয়েটিকেও তুমি ভালবাস—

কেশব এবার মুখ খোলে, 'ভালবাসি সার?'

: ভালবাস বৈকি। বিধবাটি কে আমি জানি না, কিন্তু সহুরে মেয়েটি কে আন্দাজ করতে পেরেছি।

কেশব ব্যাকুলভাবে বলে, আপনার একথাটা ধরতে পারলাম না সার। অবাস্তব ছাঁকা দরদের লোভ আমার থাকতে পারে, ও ব্যাপারটা খানিক খানিক বুঝতে পারছি। কিন্তু ভালবাসব অথচ ভোগ করতে চাইব না, আমি ওসব ন্যাকামিতে বিশ্বাস করি না। সহুরে মেয়েটিকে যদি ভালবাসতাম মনে মনে অন্ততঃ চাইতাম নিশ্চয়—

: চাইতে বৈকি—এখনো চাও। মানুষটা তুমি খুব হিসেবী তো, রিয়ালিটি যেটুকু বোঝ সেটুকু মেনে নিতে পার, যা সম্ভব নয় জানো সেটা নিয়ে ন্যাকামি কর না। তুমি স্পষ্ট জানো যে যতই ভালবাস আর যতই কামনা কর, মেয়েটি তোমায় ভালও বাসবে না ধরাও দেবে না। অসম্ভব জানো বলেই মনের চাওয়াটা নিয়ে মনে মনে ঘাঁটাঘাঁটি করে মিথ্যে স্বপ্ন দেখার বদলে সাধটা মনের মধ্যেই চেপে দিয়েছ। যতটা ঘনিষ্টতা সম্ভব ততটাই মেনে নিয়েছ, বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে সবটা তিতো করে দেবার চেষ্টা করনি।

ডাক্তার দত্ত হাসে।—এই মেয়েটির সম্পর্কে একটি প্রশ্ন গোড়ার দিকে তোমায় জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম। তারপর আর দরকার মনে করলাম না। প্রশ্নটা কি জান? মেয়েটি তোমার পছন্দমত ভালবাসা নিয়ে ধরা দিতে চলেছে—ঘুমিয়ে এরকম স্বপ্ন কোনদিন দেখেছ কিনা।

কেশব পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে।

ডাক্তার দত্ত বলে, আচ্ছা আরও একটা দিক বিবেচনা করার আছে। যেরকম ভালবাসা তোমার প্রাণ চায় তুমি জানো ললনার ধাতেই তা আসবে না।

কেশব বলে, কিরকম ভালবাসা চাই আরেকটু বুঝিয়ে বলুন।

ঃ কিরকম ভালবাসা চাও? যেরকম জীবন চাও তার সঙ্গে যেটা খাপ খায়। সব মানুষ এই নিয়মেই ভালবাসা চায়। সহুরে আধুনিক জীবন যে চায় সে ওই রকম ভালবাসাও চাইবে, যে সেকেলে গ্রাম্য জীবন পছন্দ করে সে সেকেলে গেঁয়ো মেয়ের ভালবাসা খুঁজবে। তোমার পছন্দ দু'রকম জীবন—অবশ্য সেই জন্যই দু'রকম জীবনের ওপরে তোমার বিদ্বেষও আছে। তুমি চাও ভালবাসার ছোট গেঁয়ো মেয়েরা সরলতা থাকবে কিন্তু যুবতী মেয়ের তীব্রতা আর গভীরতা থাকবে—নিষ্কাম অন্ধ ভালবাসা হবে অথচ কোনরকম ন্যাকামি থাকবে না, আবার ললনাদের ভালবাসার মত মার্জিত ও হবে, বৈচিত্র্যও থাকবে এইটাই শেষ কথা নয় কিন্তু। ভালবাসাটা আবার মনগড়া কিছু চলবে না—রক্তমাংসের মানুষের ভালবাসা হবে, বাস্তব পৃথিবীর ভালবাসা হবে।

কেশব খানিকক্ষণ হতভম্বের মত বসে থাকে।

তারপর ধীরে ধীরে বলে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সার। আমার মত মেশাল জীবন তো অনেকের আছে, সবার কেন হিষ্টিরিয়া দাঁড়ায় না?

ডাক্তার দত্ত খুসী হয়ে বলে, সুন্দর প্রশ্ন করেছ। বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন করেছ। তুমি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে, তোমার অসুখ নিশ্চয় সেরে যাবে। যাদের এরকম মিশেল জীবন, হিষ্টিরিয়া না দাঁড়াক সংঘাতটা কম বেশী তাদের মধ্যেও আছে। তুমি কি সকলের

চেয়ে পৃথক মানুষ? ভিন্নরকম মানুষ? কতগুলি যোগাযোগ ঘটে তোমার বেলা সংঘাতটা দাঁড়িয়ে গেছে হিষ্টিরিয়ায়, এইমাত্র। আরও অনেকের বেলাও এরকম নিশ্চয় ঘটেছে। তুমি তেজী একগুঁয়ে মানুষ—এটা একটা বড় ফ্যাক্টর কিন্তু সেটাই আসল নয়। তুমি যদি আপসে চাকরী করতে কিম্বা অন্য কোন ভদ্র পেশা নিয়ে ললনাদের জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে, ব্যাপার অন্যরকম হত। সংঘাতটা আসত কিন্তু অবস্থা অনুসারে আপোষ করা সামঞ্জস্য করার ব্যবস্থাও হত। রোজগার কম হলে খানিকটা সামঞ্জস্য করে সংঘাত নিয়েই জীবন কাটাতে—বেশী রোজগার হলে ওদিকের মায়া কাটিয়ে ললনাদের মধ্যে ভিড়ে পড়তে। কিন্তু তুমি পেশা নিলে মোটর চালানোর—রিয়ালিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। জীবনের রাফ সাইড্‌টার পরিচয় পেলে। তোমার ওদিকের জীবনে, ললনাদের জীবনে, আরও উঁচুস্তরের বড় বড় লোকদের জীবনে কত ফাঁকি কত মিথ্যার রঙ চড়ানো সে সব তোমার কাছে ধরা পড়তে লাগল। দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক হলে সংঘাতটা সইয়ে নেবার এড়িয়ে যাবার পথ খুঁজে নিতে,—নেশাটেশা করে জীবনটা খানিক বিগড়ে দিয়ে সামলে যেত। তেজ আর একগুঁয়েমির জন্য তোমার হল মুস্কিল। তুমি আপোষ করলে না—হুটো জীবনকেই ভোগ করতে চাইলে। অসম্ভবকে চাইলে, স্বপ্নকে বাস্তব করার সাধটা আঁকড়ে ধরলে। ফল দাঁড়ালো হিষ্টিরিয়া।

ডাক্তার দত্ত খানিকক্ষণ কেশবের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বলে, আজকেই সবটা বুঝে ফেলা যাবে না। একা তোমার পেছনে অত সময়ও দেওয়া যাবে না। ক্রমে ক্রমে খোলসা করতে হবে।

: সেরে যাব তো?

: নিশ্চয়। এমন শক্ত সবল শরীর, তার ওপর তোমার বুদ্ধি আছে বাস্তব-বোধ আছে। সহজেই সেরে যাবে।

এবার অন্য রোগীর পালা।

কেশব উঠে দাঁড়িয়ে বলে, শেষ কথাটা জিজ্ঞেস করে যাই। আর সব যেমন আছে তেমনি থাকবে, আমি ব্যাপারটা বুঝলেই সেরে যাবে? এটাতেই বড় খটকা লাগছে মনে।

ডাক্তার দত্ত হেসে বলে, সব যেমন আছে তেমনি থাকবে কেন? ব্যাপার তলিয়ে বুঝলেই তুমি আর মিথ্যা অসম্ভব সাধ নিয়ে অস্থির হবে না, তোমার রোগটা সেরে যাবে।

হাসি বন্ধ করে বলে, একটা কথা মনে রেখো। আমার কাছেও অসম্ভবকে সম্ভব করার আশা কোর না। আমি ডাক্তার আমি তোমার রোগটাই সারাতে পারি, তোমার জীবনে সুখ শান্তি আনন্দ এসব এনে দিতে পারি না। তোমার মাথা ঘোরে, গলা শুকিয়ে যায়, বুকটা হঠাৎ ধড়াস করে ওঠে, রাত্রে ঘুম হয় না—এসব আমি সরিয়ে দেব। তার বেশী কিছু আশা কোরো না। তোমার বাস্তব জীবনটা যদি দুঃখের হয়, মনের দুঃখে রাত্রে যদি তোমার ঘুম না হয়—তোমায় আমি বড় জোর ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি। তোমার দুঃখ আমি দূর করতে পারব না।

আপনি শুধু আমার রোগটা সারিয়ে দিন।

সন্ধ্যার পর কানুকে বিবরণ জানাতে গিয়ে কেশব ছাখে, কানু বিছানায় শুয়ে আছে, তার বাঁ পায়ে আর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

: কি ব্যাপার রে?

: ব্যাপার আর কি, অ্যাক্‌সিডেন্ট।

কাজ করতে করতে দুর্ঘটনা ঘটে। পায়ের তিনটি অঙ্গুল ছেঁচে গিয়েছিল, হাসপাতালে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে। মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

: কি করে হল ?

: আর বলিস কেন, ব্যাটারা যত সস্তা রদ্দি মেসিন দিয়ে কাজ চালাবার চেষ্টা।

দুর্ঘটনায় বিবরণ শুনতে শুনতে কেশব হঠাৎ বলে ওঠে, আরে, পরশু না তোর বিয়ে ?

সারা মাথায় ব্যাণ্ডেজ জড়ানো, শুধু মুখ খোলা। কানু হেসে বলে, জরটার যদি না এসে যায়, পায়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে বিয়ে করতে যাব। ওদের বিশ্বেস নেই বাবা। আজ একরকম ভাবে কাল আরেকরকম ভাবে—সময় পেলে একটা গোলমাল পাকিয়ে বাসবে কিনা কে জানে।

কেশবও একটু হাসে।—তুই এমন বিয়ে পাগল হয়ে উঠবি কোনদিন ভাবতেও পারি নি।

: বিয়ে পাগল মানে ? ওকে আমি বিয়ে করবই। ফাঁক পেলে যদি জোর করে অন্য কারো সঙ্গে গেঁথে দেয় ? নইলে দু'চার ছ' মাস এদিক ওদিক হল তো বয়ে গেল।

: জোর করে কারো সঙ্গে গাঁথতে পারবে না। ও মেয়ে শক্ত আছে। ওকে নোয়ানো যাবে না। জোরটা পেল কোথা থেকে তাই ভাবি। ভারি আশ্চর্য্য লাগে।

: আশ্চর্য্যের কি আছে ? দিন কালটা দেখতে হবে তো। বোকা নরম পুতুল হয়ে থাকা মেয়েদেরও আর পোষাচ্ছে না বাবা।

দিনকাল ঘাড়ে ধরে শক্ত বানিয়ে দিচ্ছে, চালাক করে দিচ্ছে,

এ কথা নিয়ে কেশব তর্ক চালায় না। তিনটে আঙ্গুল গেছে, মাথা কেটেছে, তবু হঠাৎ সে বন্ধুর সম্পর্কে দারুণ একটা ঈর্ষা অনুভব করে।

ভাবে, গাড়ী চালানো শিখে বড়লোকের গাড়ী চালানোর বদলে সে যদি কানুর মত গাড়ীগুলি মেরামত করার কাজ শিখত!

জীবনের গতিটাই হয় তো তার একেবারে হয়ে যেত অন্যরকম।

রোগও হত না, ডাক্তার দত্তের কাছে চিকিৎসার জন্য ধন্নাও দিতে হত না।

মেয়েলি মার্কা নয়, পুরুষালি মার্কা নয়, হিষ্টিরিয়া। তবু কি বিশ্রী রোগ। কানু মিস্ত্রী কেন, ঝুঁকা মুটে হয়েও যদি এ রোগের দায় এড়ানো যেত, তাও হত অনেক বড় সৌভাগ্যের কথা।

: কম্পেনশেসান পাবি না?

: পাব না? ইয়ার্কি নাকি! তিনটে আঙ্গুল গেছে, মাথা ফেটেছে, কম্পেনশেসান পাব না? দেবে তো কয়েকটা টাকা, আঙ্গুল তাতে জোড়া লাগবে?

ঝাঁজের সঙ্গে জোর দিয়ে কথা বলতে যাওয়ায় মাথায় বোধ হয় ঝাঁকি লাগে। কানু মুখ বিকৃত করে।

কেশব বলে, যদি না দেয়? যদি বলে তোর নিজের দোষে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে!

: যদি না দেয় মানে? ঘাড় দেবে! বেশ মোটারকম কম্পেনশেসান দেবে। নইলে বাছাধনকে ছেড়ে দেব ভেবেছিস? পচা রদ্দি মেসিন দিয়ে কাজ চালাবে, অ্যাকসিডেণ্ট হলে কম্পেনশেসান দেবে না—ইয়ার্কি নাকি?

কান্থর মা চা দিয়ে যায়। বলে, চেয়ে দ্যাখো কাণ্ডখানা। লেখা-পড়া শিখবে, অফিসে ভাল চাকরি করবে, সুখে থাকবে। তা নয়, লেখাপড়া শিকেয় তুলে সায়েব তাড়াতে গিয়ে জেল খাটা চাই। কি দরকার তোর সাহেব তাড়িয়ে ? চাকরিগুলো তো বানিয়েছে সায়েবরাই। লেখাপড় শেখ, একটা সায়েব নয় তার পেয়ারের লোককে ধরে চাকরী বাগা।

কথা যাই বলুক, যে মনোভাবই প্রকাশ পাক কথায়, দুর্ঘটনায় আহত ছেলের জন্ম মায়ের দরদ আর বেদনাই উথলে বেরিয়ে আসছে টের পেয়ে তারা চুপ করে থাকে।

কেশবের মনটাও নাড়া খায়। সেও চুপ করে শোনে।

তবু তার মনে প্রশ্ন জাগে, এও কি হিষ্টিরিয়া ?

কান্থর মার এক চোখে ছানি পড়তে সুরু করেছে, চুপসানো মুখে একটি দাঁতেরও বালাই নেই। কান্থ তার শেষ বয়সের শেষ ছেলে ! আগের ছেলে মেয়েগুলি কোনটাকে আঁতুর থেকে কোনটাকে শৈশব কালে যম টেনে নিয়ে গেছে।

চায়ে চিনি ঠিক হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে কান্থর মা আবার আবেগের সাঙ্গ সুরু করে, মরার সময় ওর বাপ বলে গিয়েছিল, ছেলেকে মান্থষ কোরো, লেখাপড়া শিখিও। মৃত্যুশয্যায় মান্থষটাকে কি বলেছিলাম জানিস বাবা ! নিজে উপোস করি তবু ছেলেকে মান্থষ করব, লেখাপড়া শেখাব। মান্থষটার মৃত্যুশয্যায় বলেছিলাম তো বটে, কিন্তু কি করি বলো ? ছেলের নেই লেখাপড়ায় মন, দেশ থেকে সাহেব তাড়াতে লাগল। জেল খেটে তাই এই মিস্তিরিগিরি করা। এবার মাথা ফেটেচে, আরবার গুলি খেয়ে মরতে হবে। কিছু দেখিনি শুনিনি জানিনি বুঝিনি ভাবছ ? সায়েব তাড়াতে পাগল হলে এদশা হবেই হবে।

এসব কথা বলতে গেলেই কানু চিরদিন চটে গেছে স্মরণ করে বুড়ীর বোধ হয় খেয়াল হয় যে তার ছেলে আর ছেলের বন্ধু চুপচাপ মন দিয়ে তার এধরণের কথা শুনছে।

: ও মা, কড়ায়ে তেল চাপিয়ে এয়েছি যে—পুড়ে গেল বুঝি। এবার মরলে বাঁচা যায়!

তারপর ওঠে কেশবের অসুখের কথা।

কানু সব শুনে বলে, সব ধাপ্পাবাজি। খালি কথার মারপ্যাচ। বাড়ী বাঁধা দিয়ে টাকাগুলো ফাঁকিবাজকে গছিয়ে দিলি।

কেশব বলে, না। ডাক্তার খুব জবর, পেটের কথা টেনে বার করে। মুখ ফুটে বলি নি, আমার কথা থেকে আঁচ করে কি বললে জানিস?

কেশব মুচকে মুচকে হাসে। আড় চোখে কানুর দিকে তাকায়। বেলার মা হঠাৎ পট করে মরে যাওয়ায় তার বিয়েটা প্রায় দুমাস পিছিয়ে গিয়েছিল। একমাস অশৌচ, তারপর একমাস বিয়ের তারিখ ছিল না। পচ্ছন্দ করা মেয়ে বেলার সঙ্গে বিয়ে—দু'জনে মিলে অনেক চেষ্টায় সম্ভব করা বিয়ে।

কানু তাই দুর্ঘটনার জন্যও বিয়ে পিছিয়ে দেবে না--ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থাতেও বেলাকে বিয়ে করে আনবে।

ললনাকে সে ভালবাসে শুনে কে জানে কানু কি বলবে! সে তো মায়ার কথাও জানে।

: কি ডাক্তার বললে?

: বললে এমনি সুবিধে হবে না জানি, তাই বাবুর মেয়েটার সাথে স্বপ্নে পিরীত জমাই। আমি একেবারে থ' বলে গেলাম মাইরি। কি স্বপ্ন দেখি সেটা পর্য্যন্ত আঁচ করেচে।

কান্থ বলে, আহা, ওটুকু আমিও বলতে পারতাম। মুখচোখ ভাল না, রঙটাও স্থবিধের নয়। কিন্তু মাইরি, কি গান গায়। আমি ক'দিন কটা মিটিং-এ গান শুনেছি। মনে হয়েছে, এরকম না হলে মেয়ে? কি ছাই একটা বেলাকে পছন্দ করেছি, বড় ছোট নজর তো আমার।

কান্থ হাসে।—সর্ব্বদা গান শুনছিস, রোজ মেলামেশা চলছে—যোয়ান মদ্দ মানুষ তুই। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে পীরিতের স্বপ্ন দেখবি না। তুই কি শুকদেব?

: স্বপ্ন দেখে লাভ?

: লোকসানের হিসেব কষে লোকে স্বপ্ন ছাখে নাকি? যে স্বপ্ন দেখতে সাধ যায় সেটাই ছাখে।

: জানিস না বুঝিস না বিস্তা ফলাস না বেশী। ভয়ের স্বপ্ন দেখিস্ নি কখনো? স্বপ্ন দেখে ঘেমে টেমে ঘুম ভাঙ্গেনি? খানিক্ষণ বুক ধড়পড় করেনি?

: সে তো আলাদা স্বপ্ন। আমি মজাদার স্বপ্নের কথা বলছি। পেট গরম না হলে কেউ কখনো ভয়টয়ের বিশ্রী স্বপ্ন ছাখে? পেট গরম হওয়াটা কি বাবা স্বপ্নের দোষ?

কতকাল ডাক্তার দত্তের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আসছে, সব শুনে এসেছে তার ব্যাধি থেকে স্থরু করে তার প্রেম আর আসল ব্যাখ্যা, কেশব সবজান্তার মত হাসে।

বলে, না ভাই, জ্ঞানবিজ্ঞানকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমাকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছেন। আমার মনের ভেতরের খবর আমার জানা নেই, উনি ঠিক ঠিক সব বাৎলে দিলেন। আমার শরীরে কোন রোগ নেই এ তো আগের ডাক্তার বলেছিল। রোগ যে মনের, শরীরে যা হয় সেটা মনের থেকে হয়, এটা ধরতে পারিনি। ইনি

ঠিক ধরেছেন। মনের রোগটা কেন হল তা পর্য্যন্ত বলে দিয়েছেন. —একি সোজা কথা ?

কেশব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

: এবার সেরে যাব।

: সেরে গেলেই ভাল।

দশ

কিন্তু কই আরোগ্য ?

দিন কাটে, মাস কাটে, আরোগ্য লাভের সূচনাও তো দেখা যায় না ?

বুঝতে তো পেরেছে সবাই। ভোরে ঘুম ভেঙে কেন সহরের জন্য মন উতলা আর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বোস-পাড়া তাকে কেন টানে, মায়ার দরদ কেন চায়, ললনার সঙ্গ কেন চায়, কিছুই বুঝতে তার বাকী নেই।

কিন্তু মাথা তো আগের মতই ঘোরে, বুক তো আগের মতই আচমকা ধড়াস করে ওঠে, অদ্ভুত এক তৃষ্ণায় বুক আর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে, জলে যে তৃষ্ণার কষ্ট মেটানো যায় না।

মাঝে মাঝে আগের মতই অজানা আতঙ্ক অস্থির করে রাখে।

টাকার দুশ্চিন্তায় রাত্রে বরং আরও বেশী ঘুম হয় না।

বাড়ী বাঁধা রাখার টাকা ফুরিয়ে এল ! এ টাকা কি করে শোধ করবে তার জানা নেই।

ডাক্তার দত্ত চেঞ্জের কথা বলেছে।

কিন্তু বাইরে কোথাও চেঞ্জে যাবার সাধ্য তার নেই। পয়সা পাবে কোথায় ?

চেঞ্জে গিয়ে বোধ হয় লাভও নেই।

রোগের কষ্ট আরও বেড়ে যাবে। থাকতে পারবে না।

ডাক্তার দত্তের কাছ থেকে অন্তত বর্তমান পরিবেশটা থেকে সরে থাকবার উপদেশ পেয়ে চন্দননগরে মামার বাড়ী কিছুদিন থাকতে গিয়েছিল।

দু'তিনটে দিন একটু ভাল লাগল, তারপরেই যেন হু হু করে চড়ে গেল রোগের সবগুলি লক্ষণ। পালিয়ে আসতে হল বোস পাড়ায় কলকাতা সহরে।

নূতন কাজ পেয়েছিল। রাজেনবাবু নামে একজন ব্যবসাদারের গাড়ী চালাবার কাজ। অনেক ঘোরাফেরা করতে হয় বলে মাইনে ছিল ভাল।

অনিমেষের লোক জুটছিল না, অল্প পয়সায় শুধু অপিসে পৌঁছে দেবার লোক পাওয়া শক্ত। প্রতিবেশী বীরেশ গাড়ী কিনলে তার সঙ্গে ব্যবস্থা করে অনিমেষ বলতেই বেশী মাইনের চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে বীরেশের কম মাইনের কাজে সে ঢুকে পড়েছে।

টাকার এত টানাটানি তবু বেশী টাকার কাজটা সে ছেড়ে দিল —ওই কাজের অসুবিধার জন্য অসুখটা বেড়ে গিয়েছিল বলে— রাজেনের কাজে ছুটি পেয়ে বাড়ী ফিরতে বড় বেশী রাত হয় যেত বলে এবং বীরেশর বাড়ীটা ললনাদের বাড়ীর খুব কাছে বলে।

অসুখ কি সারবে না ?

ডাক্তার দত্তকে চিন্তিত দেখায়।

: তুমি গলদটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ না। তোমার ভুল ধারণার ঠিক কোনটা ভুল, আর কেন ভুল ধরতে পারছ না।

: পারছি বৈকি সার। এমন জলের মত করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তারপরেও বুঝতে বাকী থাকে ?

: তোমার রাগ আর বিতৃষ্ণার কারণটা বুঝেছ ? তোমার ঘরোয়া জীবন, অনিমেষবাবুদের সভ্য জীবন,—দুটো জীবন তোমায় কেন টানে, তবু দুটো জীবনের ওপরেই কেন এত গায়ে জ্বালা ?

কেশব জোর দিয়ে বলে, শুধু বুঝেছি সার ? মনে প্রাণে অনুভব করছি।

ডাক্তার দত্ত আবার জিজ্ঞাসা করে, বুঝে হোক না বুঝে হোক, অ্যাদ্দিন যা চাইছিলে সেটা অবাস্তব অসম্ভব কল্পনা, এটা বুঝেছ ঠিকমত ? হাজার জোরের সঙ্গে সারাজীবন চেয়ে গেলেও তোমার উদ্ভট কামনা কোনদিন মিটবে না ?

কেশব বলে, বুঝেছি সার।

ডাক্তার দত্ত গম্ভীর মুখে বলে, এসব বুঝলে তো ভুল ধারণা থাকার কথা নয়। বুঝবার পরেও উদ্ভট অসম্ভব ইচ্ছাটা বজায় থাক, তাতে এসে যাবার কথা নয়। কত মানুষের কত সঙ্গত সম্ভব ইচ্ছা মেটে না। সেজন্য হিষ্টিরিয়া হলে গরীব মানুষ যত আছে সবাইকে রোগটা ধরত। তাদের মধ্যেই বরং এ রোগটা সব চেয়ে কম। তা হলেই বুঝতে পারছ, তুমি কি ভাব না ভাব তাতে আসে যায় না, তুমি কি চাও বা না চাও তাতেও আসে যায় না যদি তোমার জানা থাকে যে ভাবনাটা ভুল, যা চাও তা পাওয়া যাবে না। জেনেশুনেও মানুষ কত গুরুতর ভুল ধারনা পুষে রাখে, অভ্যাস ছাড়তে পারে না। তার ফলে আর যাই হোক, এ রোগের সিমটম্‌স দেখা দিতে পারে না। ভুল ধারণা সত্যের মত মনটা দখল করে না থাকলে শরীরে প্রভাব খাটাতে পারে না।

: মনের গলদ চিনতে পারলেই কি সেরে যায় ?

: না। সেটা আমার পয়েন্ট নয়। তোমার মনের গলদ সারিয়ে

দেবার দায় আমার নয়—তোমাকে শুধু গলদ চিনিয়ে দেওয়া আমার কাজ। জানবার বুঝবার পরেও গলদ থেকে যেতে পারে, তোমার ইমোশনকে কণ্ট্রোল করতে পারে—কিন্তু তখন তার একটা লিমিট থাকবে। ইমোশনের গোলমাল এতটা চড়বে না যাতে অসুখটার লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। বুঝতে পারছ কথাটা? হিষ্টিরিয়ার জন্য একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা দরকার—সেজন্য ইয়াং গার্লদের মধ্যে এ রোগটা বেশী দেখা যায়। এই মানসিক অবস্থার আসল কথাটা কি? ভুল ধারণা বদ্ধমূল হবে—দেহ মনের কাজ নিয়ন্ত্রণ করবে। তোমার বুঝবার মত করেই বলি। যেমন ধরো, হিষ্টিরিয়ার কান্না। ছেলে মরে গেলে মা পাগলের মত কাঁদে। তার কান্নার মানসিক কারণটা শোক। কিন্তু এটা হিষ্টিরিয়া নয় এইজন্য যে ওই মানসিক কারণটার একটা বাস্তব কারণ আছে—ছেলের মরণ। এই বাস্তব কারণটা বাদ দিলেই মার কান্নাটা হয়ে যাবে হিষ্টিরিয়া কান্না। ছেলে মরে নি অথচ এরকম কি করে হওয়া সম্ভব? ছেলে না মরলেও মার মনে যদি ধারণা জন্মায় যে তার ছেলে সত্যি মরে গেছে—মনের ওই ভুল ধারণাটা তখন শোকের কারণ হয়ে মাকে কাঁদাবে। প্রক্রিয়াটা বুছতে পারছ?

: পারছি।

: হিষ্টিরিয়ার একটা লক্ষণ ধরা যাক। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে যতখানি দরদ আর সহানুভূতি পেলে সুস্থ মানুষের চলে যায় —রোগীর তাতে চলে না। তার একটা ভুল ধারনা জন্মায় যে তাকে সকলের আরও বেশী ভালবাসা উচিত, তাকে নিয়ে সকলের আরও বেশী ব্যস্ত আর বিব্রত হওয়া উচিত। অন্যভাবে উচিতটা হয় না দেখে সে রোগের ভান করবে। তার ধারণা, রোগ হয়েছে

বলে তাকে নিয়ে সবাই ভাবনা চিন্তা করবে, ব্যস্ত আর বিব্রত হয়ে পড়বে, এটাই হবে তার মস্ত সুখ। সংঘাত থেকে তোমারও এই রকম একটা মানসিক অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে, কতগুলি ভুল ধারণা জন্মেছে। এইজন্য তোমার ভিতরকার সংঘাত আর তার কারণগুলি আমাকে এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝতে হয়েছে, তোমাকে বোঝাতে হয়েছে। ভুল ধারণাও মানসিক বিকার কিন্তু রোগীর যদি জানা থাকে এটা বিকার—বিকারটা বজায় রাখলে এমন কি বাড়িয়ে গেলেও আর যাই হোক, হিষ্টিরিয়া হবে না। তুমি বিকৃত ইচ্ছা, বিকৃত চিন্তা-ভাবনা মনে লুকিয়ে রাখো, গোপনে তোমার বিকৃত সাধ মেটাও—সেটা আলাদা ব্যাপার। তা থেকে হিষ্টিরিয়া জন্মায়না।

কেশব নিশ্বাস ফেলে বলে, তা হলে অবস্থাটা কি দাঁড়াল সার? রোগটা আরোগ্য হবেনা?

ডাক্তার দত্ত অভয় দিয়ে বলে, ভড়কে যেওনা। তোমার বোঝার মধ্যে গলদ রয়েছে—গলদটা আমাকে ধরতে দাও।

আজ কেশবের প্রথম মনে হয় যে তার বোঝার মধ্যে নয়, ডাক্তার দত্তের বোঝার মধ্যেই কোন গলদ আছে। তার রোগটাকেও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছেনা।

বড়লোক রোগীরই চিকিৎসা করে এসেছে এতকাল, তার ধাতটা ঠিক ধরতে পারছেনা। এত চেষ্টা করেও চিকিৎসার ফল হচ্ছেনা।

অর্থাৎ অসুখটা তার সারবে না।

ডাক্তারের কাছে যাবার জন্য দু'ঘণ্টার ছুটি নিয়েছিল, বীরেশের বাড়ী ফিরে না গিয়ে সে সটান বাড়ী ফিরে যায়।

হতাশার বদলে এবার সে বোধ করে প্রচণ্ড জ্বালা। রাগে

আর ক্ষোভে যেন ফেটে যেতে চায় বুকটা। যে চিকিৎসা সবার বেলা খাটে, তার বেলা সে চিকিৎসাটা পর্য্যন্ত খাটবে না? তার রোগ আরোগ্য হবে না?

কেন আরোগ্য হবে না?

কেন তার এই অভিশাপ?

ছটফট করার বদলে সে এবার গুম খেয়ে থাকে। কাজে যায় না, কারো সঙ্গে কথা বলে না, পুরো তিনটে দিন চুপচাপ ঘরে বসে কাটিয়ে দেয়।

ডাক্তার দত্তের কথাগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবে।

আজ পাঁচ মাসের ওপর ডাক্তার দত্তের কাছে তার আনাগোণা। কত কম টাকা নিয়ে কত ধৈর্য্যের সঙ্গে কত সময় দিয়ে ডাক্তার দত্ত তার রোগটা বুঝবার চেষ্টা করেছে, তার চিকিৎসা চালিয়ে এসেছে।

সে অবশ্য জানে এটা দয়া বা খেয়াল নয় ডাক্তার দত্তের। তার টাইপের রোগীর চিকিৎসা আজ পর্য্যন্ত সে করেনি, সে একেবারে নতুন রকম রোগী। তাই তার বৈজ্ঞানিকের মনে টাকার কথা সময়ের দামের কথা বড় না হয় আগের সঙ্গে তার রোগটা বিশেষভাবে পরীক্ষা করার, এবং চিকিৎসা করে তাকে আরোগ্য করার জোরালো তাগিদ জেগেছে।

দিনের পর দিন এত করে যে কথাগুলি ডাক্তার দত্ত তাকে বোঝাতে চেয়েছে, তার কোন কথাটা সে বোঝেনি?

মনে তার অনেক অন্ধকার। সমাজ আর জীবন, বাস্তবতা আর মানসিক প্রক্রিয়া—এ সমস্ত তলিয়ে বুঝবার সাধ্য তার নেই।

কিন্তু ডাক্তার দত্ত গোড়াতেই স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছে যে তাকে

তত্ত্বকথা বোঝাবার কোন চেষ্টাই করা হবে না, তত্ত্বকথা বুঝে তবে তার রোগটা বুঝবার দরকারও হবে না।

ডাক্তার দত্তের ভাষাটা পর্য্যন্ত মনে আছে। আঙ্গুল উ`চিয়ে হাসি মুখে বলেছিল : অর্থাৎ, তোমাকে আরেকজন ডাক্তার দত্ত হয়ে উঠবার কোন প্রয়োজন হবে না। তুমি নিজের কমনসেন্‌স দিয়ে তোমার নিজের জীবনের মানেটা বুঝলেই যথেষ্ট হবে।

কী স্বস্তিই সেদিন বোধ করেছিল!

সত্যই তো, তার জ্ঞান বুদ্ধির বোধগম্য করে না বললে সে যে কিছুতেই বড় বড় কথা বুঝবে না এটা যার খেয়াল আছে সে কি সোজা সাধারণ স্পেশালিষ্ট।

নইলে সে কি এমন জোরের সঙ্গে বলতে পারে যে কমলের রোগ বংশগত নয়, পুরাণো চিকিৎসায় ফল হবে না? তিন পুরুষ ধরে জানা আর প্রমাণ করা সত্যকে বাতিল করে এমন জোরের সঙ্গে কথা বলা কি মুখের কথা?

তিন পুরুষ ধরে কমলের বাপ ঠাকুর্দ্দারা পাগল হয়েছে বংশগত কারণে, লাগসই পুরানো চিকিৎসায় তারা সেরে গিয়েছে।

কিন্তু কমল পাগল হয়েছে অন্য কারণে, তার ভিন্ন চিকিৎসা দরকার—তিন পুরুষের সত্যকে বাতিল করে জোর গলায় একথা কি কেউ বলতে পারে সবকিছু স্পষ্ট পরিষ্কার ভাবে না জেনে না বুঝে?

তবু তার বেলাই ব্যর্থ হয়ে গেল এত বড় অভিজ্ঞ স্পেশালিষ্টের রোগ নির্ণয় আর চিকিৎসা।

তাকেও কি কম জোরের সঙ্গে ডাক্তার দত্ত জানিয়েছে যে তার রোগ কি তা জানা গেছে, চিকিৎসা কি হবে ঠিক করা গেছে, সে নিশ্চয় সেরে যাবে?

তাকে তো বুঝতেই হবে এটা কি ব্যাপার।

পাগল কমল সেরে যাবে।

তার রোগটা কেন সারবে না? এরও একটা কারণ আছে নিশ্চয়?

চারদিনের দিন প্রায় রাত্রি থেকে উঠে একটিবার সহরে যাবার জন্য, ললনার সঙ্গে একটু মেলামেশার জন্য, অস্থির হয়ে ওঠে কেশবের মনপ্রাণ।

মায়ার সঙ্গেও এ ক'দিন দেখা সাক্ষাৎ কথাবার্তা নেই।

এ রাত্রিটা ভোর হয়েছে। সহর থেকে ফিরে আজ রাত্রেই মায়াকে সে টের পাইয়ে দেবে, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে না পারুক কত সে তাকে ভালবাসে।

ভোর রাত্রে ঘাটে নাইতে গেলে কাঁচের গেলাসে চুরি করে সদ্য দোয়া উষ্ণ টাটকা দুধ নিয়ে মায়া আজ আসে না।

বাছুর বড় হয়েছে। দুধটাও ঘন হয়েছে। বেশি দুধ আনবার সাহস মায়ার হয় না, কোন গরু কত খেলে কত দুধ দেয় সে হিসাব গোয়ালা কেন, ছা-পোষা গেরস্থরও জানা হয়ে গেছে। যেটুকু দুধ মায়া আনে, এক চুমুক খেয়ে কেশবের মনে হয় খানিকটা অমৃত পান করল।

আজ মায়া না আসায় কেশব ভাবে, ভোরের আগেই ঘাটে এসেছে রাত থাকতে! মায়া বুঝি তাই টের পায়নি।

আধঘণ্টা পরে আবার সে ডোবায় আসে। আধঘণ্টা আগে যে ডোবায় এসে ডুব দিয়ে গেছে সেটা বাতিল করতে হয় বাধ্য হয়ে।

শীতের রাত্রিশেষে একবার ডুব দিয়েছে মায়ার জন্য, আজ রাত্রে

তাদের দেখা হবে মায়াকে এই সুসংবাদ জানিয়ে খুসী করার জন্য, ভোরে আরেকবার তাকে ডুব দিতে আসতে হল ডোবায়।

মায়া তখন আসে।

দুধের গেলাসের বদলে কয়েকখানা এঁটো বাসন হাতে নিয়ে এসে বলে, রাগ কোরো না। দুধ দুয়ে নিয়ে চুরি করে খাই বলে পরশু সকালে বাখারি দিয়ে মেরেছে। পিঠে কালচে পড়ে গেছে একেবারে। দেখবে?

সায়া ব্লাউজের বালাই নেই মায়ার। আঁচলটা সরিয়ে দিতেই কাঁধ থেকে কোমর পর্য্যন্ত টানা ব্লু ব্ল্যাক কালির মত মৃত রক্তের কালশিরাটা চোখে পড়ে।

খুব জোরেই বাখারি মেরেছে।

কেশব বলে, এমন করে তোমায় মারতে পারে? তুমি কি করলে?

: কি আর করব? কপালের নিন্দে করে খানিকক্ষণ কাঁদলাম।

বাসন কখানা চটপট মেজে নিতে নিতে মায়া কথা বলছিল—মুখ না তুলেই। তার মানেও কেশব জানে ঘাটে একা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখে আবার যদি পিঠে বাখারি বসায়।

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে কেশব বলে, আমারও তোমায় মারতে ইচ্ছে করছে।

ধোয়া বাসন হাতে মায়া উঠে দাঁড়ায়।

: তবে আমি পালাই। বেলায় যাব।

বলেই মায়া যেন মিলিয়ে যায় ভোরের আবছা আলোয়।

মায়া বেলায় আসবে জানিয়ে রাখলেও কেশব বেরোবার জন্য তৈরী হয়।

মনটা একেবারে বিগড়ে দিয়েছে মায়া।

বাখারি দিয়ে অমন করে মায়াকে মেরেছে, চুরি করে তাকে দুধ খাওয়ানোর পুরস্কার মায়া পেয়েছে চুরি করে নিজে দুধ খাওয়ার অপবাদ আর পিঠের কালসিটে দাগ।

তবু কেশব বিন্দুমাত্র মমতা বোধ করে না।

মার খেয়েও মায়া চুপচাপ সয়ে গেছে, এই বাড়ীতেই মুখ গুঁজে পড়ে আছে—এই কথা ভেবেই গা যেন তার জ্বলে যেতে থাকে।

গা বমি বমি করার মত তীব্র একটা বিতৃষ্ণা যেন ভিতরে পাক দিয়ে উঠতে চেয়ে শরীরটাকে অসুস্থ করে দেয়।

ওকি মানুষ? ওতো গরু ছাগলের সামিল। ভাত-কাপড় আর একটু আশ্রয়ের জন্য পশুর মত এমন মার নইলে নীরবে হজম করে যায়।

রাত্রির অন্ধকারে ওরই সঙ্গে ভালবাসার খেলা খেলবার জন্য পাগল হয় বলে আজ যেন প্রথম সে নিজের ওপর সত্যিকারের ঘৃণা বোধ করে।

কেশব বেরিয়ে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে পাগলের মত চেহারা নিয়ে হাজির হয় ভুবন।

ঃ কি ব্যাপার ভুবনদা'?

ভারি বিপদে পড়েছি ভাই।

ভুবন ধপাস করে চৌকীতে বসে পড়ে।

পাগলের মত চেহারা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসুক, ব্যাপার সে প্রকাশ করে ধীরে ধীরে নির্জীব নিস্তেজ মানুষের মত।

মোহিনী দু'দিন আগে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। কিছু না জানিয়ে কোন ফাঁকে এক কাপড়ে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল ভুবন টের পায়নি।

প্রথমে সে ভেবেছিল কারো সঙ্গে বুঝি বেরিয়েই গিয়েছে মোহিনা। তারপর ভেবেচিন্তে সে দমদমে শালার কাছে ছুটে যায়। বেরিয়ে যদি না গিয়ে থাকে তবে ভাই-এর কাছেই যাবে, মোহিনীর আর কোথাও যাওয়ার যায়গা নেই।

সেখানে গিয়ে জানতে পারে মোহিনী কারো সঙ্গে বেরিয়ে যায়নি, ভায়ের বাড়ীতেই গিয়েছে।

: তাহলে বিপদ কিসের?

ভুবন মুখখানা কাঁদ কাঁদ করে বলে, আমার কাছে আর আসবে না বলে দিয়েছে ভাই। একবার দেখা পর্যান্ত করলে না। ভাইকে দিয়ে বলে পাঠালে এ জন্মে আমার মুখ দেখবে না, ভাই-এর কাছে থেকে সিনেমার রোজগারে পেট চালাবে। ওখানে গিয়ে যদি বিরক্ত করি ভায়ের বাড়ী থেকেও বেরিয়ে যাবে। ভয়ে পালিয়ে এলাম ভাই।

কেশব বলে, ঠিক করেছেন। অত ভাবছেন কেন? ঝোঁকের মাথায় ভায়ের কাছে গেছে, ঝোঁকটা কেটে গেলেই ফিরে আসবে। এত বিবেচনা করছেন, আপনার দিকটা বিবেচনা করবেই না?

ভুবন মাথা নাড়ে।

: না, আমি টের পেয়েছি, ও আর আসবে না।

মনে হয় ভুবন বুঝি কেঁদেই ফেলবে।

হঠাৎ সে কেশবের হাত চেপে ধরে বলে, তুমি একটিবার যাবে ভাই? তোমার কথা মানে, তুমি গিয়ে হয়তো বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে পার।

কেশবের মায়া হয় না।

মনে মনে বরং হাসি পায়।

ধীরে ধীরে বলে, পাগল হয়েছেন ভুবনদা, আপনার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত

করল না, আমি গিয়ে বুঝিয়ে বললেই চলে আসবে? আপনি বরং এক কাজ করুন। একখানা চিঠিতে স্পষ্ট লিখে দিন যে এবার থেকে আপনি আর দিনরাত বৌদিকে চোখে চোখে চোখে রাখবেন না, স্বাধীন-ভাবে চলাফেরা করতে দেবেন, সিনেমায় ঢুকতে চাইলেও কোন আপত্তি করবেন না।

ভুবন বিরস মুখে চেয়ে থাকে।

কেশব বলে, এ ছাড়া আমি তো করার কিছু ভেবে পাচ্ছি না। এভাবে যখন বৌদি গেছে, মনটাকে শক্ত করেই গেছে। সিনেমায় বৌদি ঢুকবেই, আপনি ঠেকাতে পারবেন না। তার চেয়ে আপনি যদি উদার ভাবে জানিয়ে দেন যে আপনি বাধা দেবেন না, বৌদি স্বাধীন ভাবে যা খুসী করতে পারবে তাহলে হয় তো ফিরে আসতে পারেন। যা খুসী করতে পারবেন মানে অবশ্য সিনেমায় গিয়ে হোক, অন্য রকম ভদ্র ভাবে হোক বৌদি পয়সা রোজগার করতে পারবে। মেয়েদের পয়সা রোজগার করার অধিকারটা আপনি উড়িয়ে দেবেন না৷ ওই নিয়ে ঝগড়া করবেন না। পরিষ্কার করে এসব লিখে দিন, বৌদি নিজেই হয়তো ফিরে আসবে।

: হয় তো!

: বৌদির মনের কথা আমি কি করে বলব বলুন?

অনেকক্ষণ গুম্ খেয়ে বসে থেকে ভুবন উঠে দাঁড়ায়।

বলে, দেখি ভেবে।

বেরোবার কথা ভুলে গিয়ে কেশব ডাকে, মিনু, এক ছিলম তামাক দে।

কল্কিতে ফুঁ দিতে দিতে মিনু এসে বলে, দাদা, তামাক।

মিন্নুর সঙ্গে মায়াকে দেখে কেশব চমৎকৃত হয়ে যায়।

এই অসময়ে মায়া কি করে এল? বাথারির ভয় না করে গোবিন্দের সংসারের কাজকর্ম্ম ফেলে, দায় এড়িয়ে?

মিন্নু নিশ্চয় আনমনা ছিল কেশবের চাউনি আর মায়ার ভাব দেখে তার মুখে অর্থযুক্ত হাসির ঝিলিক খেলে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে সে করে বসে আরও বেশী বোকামি। জিভের ডগায় কামড় দিয়ে ফেলে।

কেশবের মনে হয় আজ সকালে তাকে ঘিরে যেন একটার পর একটা নাটক হয়ে যাচ্ছে। অথবা এরকম নাটক রোজই ঘটে, নজর দেয় না বলে তার চোখে পড়ে না? মিন্নুর মুখের সামান্য একটু হাসির ঝিলিক আর জিভের ডগায় কামড় দেওয়ার পিছনে কত বড় গুরুতর বাস্তবতা আছে ভাবতে গিয়ে কেশবের মাথা ঘুরে যায়।

কেশব গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে মায়াকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার রান্নাবান্না হয়ে গেছে?

মায়া বলে, এর মধ্যে হয়ে যাবে? এই তো সবে কলির ন'টা বাজলো তোমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে শুনলাম? কদিন পাগলের মত করছ? দিনরাত ঘরের মধ্যে মুখ গুঁজে থেকে নিজের মনে বিড় বিড় করছ?

ঃ হ্যাঁ। তুমি কার কাছে শুনলে?

মিন্নু আস্তে আস্তে সরে যায়।

তার কেটে পড়ার রকম চেয়ে দেখতে দেখতে চোখে যেন পলক পড়ে না কেশবের।

তারপর সে সোজাসুজি মায়াকে জিজ্ঞাসা করে, মিন্নু টের পেয়েছে আমাদের কথা?

: কিছু কিছু টের পেয়েছে বৈকি। একি একেবারে গোপন থাকে মেয়েদের কাছে ?

মায়ার মুখে আজ এ কি ধরণের কথা! কেশব যেন আকাশ থেকে পড়ে।

: কি করে টের পায় মেয়েরা ? তুমি জানতে দিয়েছ ?

মায়া যেন একটু ভয় পেয়ে যায়।

: তার মানে ? আমি জানতে দেব কি গো! আমার কি মাথা খারাপ ? চালচলন দেখে মেয়েরা এমনিই টের পেয়ে যায়। এতকাল ধরে আমরা—

মায়া আর জের টানে না তার কথার।

গলা চড়ানোর উপায় নেই, কেশব তাই মুখ খিঁচিয়ে বলে, এ্যাদ্দিন বল নি কেন মেয়েরা টের পেয়ে গেছে ?

মায়া দাঁতে দাঁত লাগিয়ে মিনিট খানেক বিস্ফারিত চোখে তার বিকৃত মুখ ভঙ্গির দিকে চেয়ে থাকে। আজ পর্য্যন্ত বিনা বিচারে সে কেশবের সমস্ত অসভ্যতা সঙ্কীর্ণতা অন্যায় স্বার্থপরতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। সে তো জানে ভালবাসার এটাই নিয়ম। মানুষটা মোটর চালায়। সহরে অর্দ্ধেকের বেশী জীবন কাটায়। দেবতা মানে না, আচার মানে না, সংসার মানে, নিয়ম মানে না—বাড়ীতে এসব যারা মানে সকলে তারা তার ভয়ে কেঁউ কেঁউ করে।

এ মানুষটার ভালবাসা পেতে হলে নিজেকে সঁপে দিতেই হবে। সীতার মত সাবিত্রীর মত নিজেকে সঁপে দেবার সাধ্য তার নেই। সীতা বা সাবিত্রী কেন, সাধারণ একটা পুরুষের সাধারণ একটা ঘরণী হয়ে খুব কষ্টকর জীবন কাটিয়েও নিজেকে ধন্য করার সাধ্য তার নেই।

সে বাতিল মেয়েমানুষ।

পুরুষ মেয়েমানুষের জোট পাকানো জীবনে সে শুধু ঝন্‌ঝাট—বাড়তি বোঝা।

অথচ মেয়েমানুষ হিসাবে একমাত্র তারই সঙ্গে কারবার এই দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ পাগলাটে মানুষটার। তাকে নিয়েই তার হিসাব-নিকাশ যে কি করে তার সামাজিক মর্য্যাদা বজায় রেখে নিজের হাজার অসুবিধা ঘটিয়েও তার সঙ্গে ভালবাসা চালিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু লাভ কি হল তার? রাধার মত এই কৃষ্ণটির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েও নিজেকে সে হারালো!

কেশবের অসহ্য ঠেকে মায়ার এরকম ভঙ্গি করে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট নেড়ে চেড়ে মনের চিন্তার বাক্য সাজানো।

সে বলে, ঢং করো না। একটা সাংঘাতিক বিপদের মুখে পড়েছি বুঝতে পারছ না?

ঃ না বুঝতে পারছি না। তোমার বিপদ কি আমার জন্যে, আমার দোষে?

কেশব খানিকক্ষণ গুম্ খেয়ে থাকে।

কথা যখন বলে বেশ টের পাওয়া যায় মায়ার উপর গায়ের জ্বালা তার কমে নি।

ঃ সে নয় বুঝলাম, এসব ব্যাপার মেয়েরা এমনিই টের পায়। তোমার কোন দোষ নেই। বুদ্ধি তোমার খুব চোখা, কিন্তু এ্যাদ্দিন বলনি কেন। চুপ করে থাকার মানে কি?

ঃ কপাল রে! এও আবার বলতে হয় নাকি? এতো সবাই জানে! সংসার ছাড়া মানুষ তো নও, কি করে জানব সোজা কথাটা তোমার খেয়ালে আসে নি?

মায়া ঝঁঝালো হাসি হাসে।

: সত্যি, অবাক করলে আমাকে। ছেলে ছোকরাও জানে লুকিয়ে ভালবাসা দু'চার দিন চলে, তাও আবার ফাঁকতালে সুযোগ বুঝে চালাতে হয়। রঞ্জন পর্য্যন্ত এটা বোঝে। নইলে তোমার বোনটির আজ গতি থাকত ?

কেশবের আবার চমক লাগে।

: বটে নাকি ?

: তবে কি ? নিজে কান পেতে শুনি নি ওদের কথাবার্ত্তা ? মিনু কি বলে জানো ? বলে, এত সস্তা নাকি আমি ? বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যত খুসী আদর কোরো। ভালবাসার পথ হয়েছে বিয়ের ব্যবস্থা করতে পার না ?

কেশবের মুখ খিঁচুনির ভাবটা বদলে গেলেও মায়া স্বস্তি পেতে ভরসা পায় না। শুধু ভাবে, মানুষটা কি বুঝেছে তার কথা এবং ব্যথা ?

কেশব খুব শান্তভাবে, প্রায় সুমিষ্ট স্বরে বলে, আমি ভাবতাম তুমি বুঝি খুব সরল—অর্থাৎ বোকা। তুমি এত চালাক ?

মায়া বোকার মতই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

কেশব বলে, আমি কি বললাম বুঝেছ ঠিক। বুঝেও না বোঝার ঢং করছ। ভয় হচ্ছে, না ? চালাকি টের পেয়ে গেছি ?

কেশবকে অবাক করে দিয়ে মায়া একটু হাসে।—তোমার কথা বুঝতে পারছি না। তবে কিসের ভয় ? তোমাকে তো আমি ভয় করি না। আগে সবাইকে ভয় করতাম—তোমার জন্য সব ভয় ভাবনা কাটিয়ে দিয়েছি। তোমাকে ভয় করব কেন ? সব ভয় কাটিয়ে দিতে তোমায় ধরলাম, তোমাকেই আবার ভয় করব ? ভারি তো লাভ হল

আমার তা হলে! কি করবে তুমি আমার? বড় জোর ত্যাগ করবে। তা তুমি করতে পার—যেদিন খুসী!

মায়া আর দাঁড়ায় না। ধীরপদে হেঁটে যায় ও ঘরের দাওয়ায় কাজের ছলে জমায়েত মেয়েদের কাছে। খানিক দাঁড়িয়ে কথাও বলে তাদের সঙ্গে। তারপর ধীরপদে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যায়।

মায়া জোরগলায় বলে গেল, সে ভয় করবে না, কেশব বড় জোর তাকে ত্যাগ করবে! যেদিন খুসী করতে পারে।

মনে হয় চরম বিদ্রূপের চাবুকই মায়া তাকে মেরে গেল।

কিন্তু বিশ্বাস হতে চায় না।

মায়া কি জেনে বুঝে হিসবে করে খোঁচাটা দিয়েছে?

জিজ্ঞাসা করেছে, কবে তুমি আমায় গ্রহণ করলে যে ত্যাগ করার ভয় দেখাচ্ছ? গ্রহণ করার লোভ দেখিয়ে খেলাই করলে এতদিন, এখন ইচ্ছা হলেই ত্যাগ করতে পার।

তোমার জন্ম আমি মরতে পারি, তোমার অসুখটা সারানোর জন্ম মরতে পারি—মায়া বলেছিল। সে কথার সঙ্গে যেন মিল আছে তার আজকের ডোণ্ট কেয়ার ঘোষণা করার—এটা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু আর কি মানে হয় মায়ার কথার?

আজ মেয়েলি অভিমানের ভাষায় খোঁচা দিয়ে গেল, এখনো আশা একেবারে ছাড়তে পারে নি।

হয় তো কেশব মন ঠিক করে ফেলতেও পারে, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতেও পারে।

পরের ঘরে দাসীর মত বিধবার জীবন তার ঘুচতেও পারে।

এ আশা নির্মূল হলে মায়া তাকে আরও স্পষ্ট আরও তিতো কথা বলবে।

ফু্‌সে ফুঁসে উঠবে।

গাল দেবে।

তার মানে কি দাঁড়ায়?

মায়ার মেয়েলি অভিনয়ের মানে ভাবতে গিয়ে নিজেকে হাস্যকর রকম বোকা মনে হয় কেশবের।

এতদিন মায়া তবে তাকে এত মায়া করে এসেছে এই আশায়!

হিসেব করে দেখেছে যে সবরকমে যেচে নিজেকে সঁপে না দিলে, নিষ্কাম মায়া মমতার জালে না জড়ালে তাকে বাঁধা যাবে না, তাকে দিয়ে বিশ্রী জীবনটা ঘুচিয়ে নিজস্ব একটি নীড়ে স্বাধীন স্বচ্ছল জীবন পাওয়া যাবে না।

কতবার মনে হয়েছে কথাটা। কতবার অনুভব করেছে মায়ার দরদের বাড়াবাড়ি অনেকটাই অভিনয়। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় নি, সাহস হয় নি। মায়া তাকে শুধু ভালবাসার খাতিরে ভালবাসে নি-- এই সহজ সরল বাস্তব কথাটা বার বার টের পেয়েও বারবার বাতিল করে দিয়েছে।

নইলে তার নিজের জীবন আর বিশ্বাসের ভিত্তিও যে একেবারে চুরমার হয়ে যায়!

মায়া ফাঁদ পেতেছে মায়ার।

ফাঁদ জেনেও চোখকান বুঝে সে ধরা দিয়েছে ফাঁদে।

মায়ার মত মানুষ যে এত হিসেব করে মায়ার ফাঁদ পাতে না, নিজের এই অন্ধ বিশ্বাসকে মর্য্যাদা দিতে ধরা দিয়েছে। এ বিশ্বাস ভেঙ্গে যাওয়া তার সাংঘাতিক বিপদ। জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাওয়া।

এই ভয়ে সে মেনে নিয়েছে মায়ার মমতার অভিনয় !

মিন্থু ঘর ঝাঁট দিতে এলে কেশব হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে মিন্থ, ও বাড়ীর ওই মায়া একটু বোকাটে হাবাটে মানুষ না ?

মিন্থু বলে, বোকা হাবা ? মায়ামাসীর মত চালাক চতুর মেয়েমানুষ এ তল্লাটে আছে ?

ঃ একটু পাগলাটে, না ?

ঃ পাগলানির ভান করে, ভারি চালাক তো। বিধবা হয়েছে, বয়েস হয়েছে, কত যে ওর সখ। এমনি লোকে নিন্দা করবে, তাই পাগলামির ভান করে সখ মেটায়। কাল কি করেছে জানো ? এই বড় মাছের আধসের পেটি এনেছিল, রান্না করে—

ঃ কে এনেছিল মাছের পেটি ?

রঞ্জন দা'।

কেশব জানে। রঞ্জন হঠাৎ একটা চাকরী বাগিয়ে ফেলেছে ভোজবাজীর খেলা দেখানোর মত। মাইনে বেশী নয়, চাকরী স্থায়ী নয়, কিন্তু চাকরী তো !

চারটাকা সের মাছের আধসের পেটি নিয়ে সে বাড়ী ফিরেছিল। হাতে মাইনে পাওয়ার আনন্দে।

কেশবের মনে পড়ে যায় যে মাসকাবার হয়েছে, তারও মাইনে পাওনা হয়েছে বীরেশের কাছে।

সেই মাছ নিয়ে কেলেঙ্কারি।

দশটুকরো করা হয়েছিল আধসের মাছ। গোবিন্দ দু'টুকরো, রঞ্জন দু'টুকরো, বাকি সবাই এক টুকরো করে।

অবশ্য মায়াকে বাদ দিয়ে। সে তো মাছ খাবে না।

মায়া বাচ্চাদের খাওয়ায়।

খেয়ে দেয়ে শুতে যাওয়ার আগে তারা দালানের ঘরে এসে লাফাতে থাকে : এইটুকু ভেঙ্গে ভেঙ্গে মাছ দিল কেন? দাদার মাছ দাদাই বুঝি একলা খাবে?

কালী বলে মাসী অদ্দেক মাছ খেয়েছে। আমি চোখে দেখেছি। বল্লে কি জান?—বলিস যদি মেরে ফেলব!

মিনু বলে যায়, মায়ামাসী তার পর যে কি কাণ্ড সুরু করল যদি দেখতে দাদা! হাসে কাঁদে দেয়ালে মাথা ঠোকে আর বলে যে বিড়ালে মাছ খেয়ে গেল, তার কি দোষ?

দৃশ্যটা কল্পনা করবার চেষ্টা করতে করতে কেশব বলে, সত্যি কথাই তো? বিড়াল মাছ খেয়ে গেলে মায়া কি করবে?

মিনু মুচকে হাসে।

: বিড়াল মাছ খায়। মানুষ সেটা টেরও পায়। বিড়াল মাছ খেলে কি কেউ হেসে কেঁদে ঢং করে মাথা কপাল কোটে? বাচ্চারা কি বিড়াল পোষে না, বিড়াল চেনে না? বিড়াল মাছ খেলে তারা বলে নাকি যে মায়ামাসী মাছ খেয়েছে? কালী নিজের চোখে দেখেছে বলেই বলছে।

: তাই নাকি।

: তাও ভাত দিয়ে খায় নি। ভাত রাঁধেনি তখনো। সকালে খাওয়ার জন্য মুড়ি কেনা ছিল। মাছ রেঁধে মুড়ি দিয়ে মাছের ঝোল খেয়ে মায়ামাসী বিড়ালকে দায়ী করেছে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে মিনু।

থেমেও যায় হঠাৎ।

কেশবের চোখ মুখ দেখে সে মাথা হেঁট করে লেপায় লেপায়

গোবরমাটির মোটা পুরু সর পড়া মেঝেতে বুড়ো আঙ্গুলে আঁচড় কাটা সুরু করে।

কেশব কোন কথা না বলায় নত মুখে নিজেই বলে, রঞ্জনদা ধমকে দিলেন, তাইতে সবাই চুপ হয়ে গেল। নইলে চুরি করে মাছ পাওয়ার জন্যে রঞ্জনদা'র বাবা নিশ্চয় লাথি কষিয়ে দিতেন মায়ামাসীকে।

কেশব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আচমকা বলে, তুই মিছে কথা বলছিস মিনু। তোর মায়ামাসীকে লাথি মারবার সাহস কখনো হয় রঞ্জনের বাবার? তোর মায়ামাসী গজ্জে উঠবে না!

: কি যে বলো তুমি। মায়ামাসী রোজ কত লাথি ঝাঁটা খাচ্ছে। চুপ করে সব সয়ে যায়। না সয়ে উপায় কি বলো? বিধবা মানুষ, কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে? লাথি ঝাঁটা মেনে নিয়েই মায়া মাসীকে চলতে হয়।

বোনের কাছে এই জবাবটাই আশা করছিল।

বেরোতে দেরী হয়ে যায়।

অনিমেষ হয় তো আপিস চলে গেছে।

হাতে পয়সা নেয়। বীরেশের কাছ থেকে মাইনেটা আজ আদায় করতে হবে।

বীরেশের নিজের ব্যবসা, নিজের আপিস। খাওয়া-দাওয়া করে ধীরে সুস্থে সে বার হয়। তার আগে গাড়ী বার করার দরকার হয় কদাচিৎ—তবু কেশব দেরী করলে সে রাগ করে।

বীরেশ রাগ করবে জেনেও দেরী করে বার হয়ে কেশব আগে যায় অনিমেষদের বাড়ী।

কাছাকাছি গিয়ে শুনতে পায় ভিতরে আট দশটি তাজা কণ্ঠকে ললনা তালিম দিচ্ছে।

গাড়ী বারন্দার নীচে সিঁড়িব কোণে বসে নিমাই বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে গান শুনছে।

: কি রে নিমাই, দোকানে কাজ নেই ?

: দোকানে তো সারাদিন কাজ—সকাল থেকে রাত দশটা পর্যান্ত। গান শুনতে পালিয়ে এয়েছি।

কেশবও গান শোনে।

সহজ তেজী সুর, সরল জোবালো কথা। দেশজোড়া মানুষের অভাব অভিযোগ দাবী দাওয়ার গান।

নতুন গান। আগে কথনো শোনে নি।

গান শুনতে শুনতে কয়েকবার রোমাঞ্চ হস কেশবের। কিন্তু এ যেন অন্য রকমের রোমাঞ্চ. আগে ললনার গান শুনে যেমন হত ঠিক সে ধরণের নয়।

আগের মত আজ আর রোমাঞ্চের সঙ্গে ভিতরে কোনরকম কষ্টকর অনুভূতি লাগছে না!

গান থামতেই নিমাই উঠে দাঁড়িয়ে বলে, পালাই। ওদিকে আবার গোসা করবে।

: তোর দেশের খবর কিরে ?

নিমাই যেতে যেতে জবাব দেয়, ওই খবর, দুভিক্ষ। মানুষ উপোস দিয়ে মরছে।

ভিতর থেকে জন দশেক তরুণ-তরুণী কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এসে চলে যায়।

কেশব একটা বিড়ি ধরায়।

ব্যস্তভাবে ললনা বেরিয়ে আসে।

গাড়ী বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে কেশবকে বিড়ি টানতে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে একমুহূর্ত্ত ভাবে।

তারপর কাছে গিয়ে বলে, বাবা আজ ছুটি নিয়েছেন, আপিস যাবেন না। আমায় এক জায়গায় পৌছে দেবেন আজ? বড় দেরী হয়ে গেছে।

একটু উদাসীন ভাব ললনার। হুকুম তো করছেই না। সে যেন অনুরোধও জানাচ্ছে না।

কলেজ যাবার তাগিদ নেই, ললনা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। কেশব তাই জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবেন?

একরকম আনমনেই সে ললনার জবাব শোনে। কয়েকদিন ললনাকে সে চোখেও গ্যাখে নি। আজ সে কাছে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দেহ মনে পুলকের সঞ্চার অনুভব করেছে। বিগড়ে যাওয়া হৃদয় মন শান্ত হতে সুরু করেছে।

মনে হয় ললনার সঙ্গ চেয়েই সে যেন ছটফট করছিল।

ললনার কথা ভাল করে শুনতে না পাওয়ায় সে সংশয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবেন বললেন? সিনেমা ষ্টুডিওতে?

ললনা হেসে বলে, আপনি দেখছি অবাক হয়ে গেলেন! সিনেমায় ঢুকেছি জানেন না? দুটো ছবিতে পার্ট করছি, গান গাইছি। পার্ট অবশ্য সামান্য, গানটাই আসল।

না থেমে শুধু সুর পাল্টেই ললনা কৈফিয়ৎ জানায়, নিজেই চালিয়ে যেতাম কিন্তু আমার ফিরতে দেরী হয়ে যাবে। যা সব এলোমেলো ব্যবস্থা ওদের। কি কাজে বাবার আবার গাড়ী দরকার হবে।

কেশব উঠে দাঁড়িয়ে বলে, চলুন আপনাকে পৌছে দিচ্ছি। আপনিও শেষে সিনেমায় নিজেকে বিক্রী করলেন?

মুখ লাল হয়ে যায় ললনার। তেমন ফর্সা নয় বলে গাল দুটি তার একটু কালচে হয়ে গেছে মনে হয়।

ঃ বিক্রী করছি মানে ?

ঃ সিনেমায় গান গাইছেন তো ! আপনি না সিনেমায় সস্তা গান ঘেন্না করেন ?

সিনেমার সস্তা দেশী আর মার্কিনী লারেলাপ্পা ধরণের গান সম্পর্কে তার ঘৃণার কথাটা ললনা অবশ্য সোজাসুজি কেশবকে জানায় নি, গাড়ীতে তীব্র আবেগের সঙ্গে বন্ধুদের কাছে বলার সময় কেশব শুনেছিল। এবং শুনে তখন রীতিমত আশ্চর্য্যও হয়ে গিয়েছিল।

ললনার গান অবশ্য এক ধরণের—তন্ময় করে দেয়, ব্যাকুলতা জাগায়। তার গান শুনতে শুনতে মজা লাগে, রাগ হয়, ঘৃণা জাগে —তেজের সঙ্গে গর্জ্জে উঠে জগৎ থেকে সমস্ত অন্যায় অবিচার দূর করতে কোমর বাঁধার তাগিদ জাগে।

কিন্তু সিনেমার গানও তো বেশ জমাট লাগে, নাচের গান একটু সুড়সুড়ি দেওয়া মজাদার লাগে ?

আগে কোনদিন ভাবেনি, ললনার মন্তব্য শোনার পর তফাৎটা খেয়াল করে ক্রমে ক্রমে সে ব্যাপারটা বুঝেছিল। ললনার গান যদি হয় খিদের সময়কার মাছ-মাংস ডাল-ভাত, সিনেমায় গান চানাচুর আর মদের চাট।

হাতের ছোট্ট ঘড়িটার দিকে চেয়ে একটু হেসে ললনা বলে, গাড়ী বার করুন। যেতে যেতে তর্ক করা যাবে।

বোধ হয় তর্ক করার জন্যই তার পাশে সামনের সিটে ললনা বসে। সে তর্ক করবে কেশবের সঙ্গে ! সে যেন ধরে নিয়েছে যে তার সঙ্গে

তর্ক করবার মত বিদ্যাবুদ্ধি না থাকলেও বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধির কেশবের যথেষ্ট আছে—তর্কটা এক তরফা ব্যাখ্যা ও উপদেশ বর্ষণ হয়ে দাঁড়াবে না।

গাড়ী চলতে সুরু করলেই সে বলে, আর্টিষ্টদের ষ্টুডিওতে নেবার জন্য ওদের গাড়ী আছে। আমার এ ঝনঝাট কেন বলুন তো? পৌঁছে দেবার জন্য আপনাকে খোসামোদ করতে হল? আমিও তো নিজেকে বিক্রী করেছি, আমিও তো আর্টিষ্ট?

কেশব চুপ করে থাকে।

: নাম করা আর্টিষ্ট হলে, খুব পয়সা টানতে পারলে আমার সময়মত সুবিধামত স্পেশাল গাড়ী পাঠাত। গাড়ী এসে ধরা দিয়ে থাকত বাড়ীর দরজায়, আমি দেরী করলে ষ্টুডিওতে দেরীতে কাজ আরম্ভ হত। কিন্তু আর দশজনের মত আমিও নিজের গরজে ষ্টুডিওতে সময় মত যাব, তাই আমার জন্য মেয়ে স্কুলের বাসের মত গাড়ীর ব্যবস্থা। চারদিক থেকে পনের বিশ জনকে একবারে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। সুটিং সুরু হবে বারটায়, দশটায় তৈরী থাকতে রাজী হলে ওদের গাড়ী আসত—

কেশব বলে, সে তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি কেন—

: নিজেকে বিক্রী করেছি? এ প্রশ্নের জবাবটাই এতক্ষণ দিলাম আপনাকে। নিজেকে বিক্রীই যদি করতাম, ষ্টুডিওতে পৌঁছে দেবার জন্য আপনাকে কষ্ট দিতে হত? নতুন নেমেছি, এখুনি একেবারে নতুন গাড়ী কিনে না দিক, অন্ততঃ গাড়ীর স্পেশাল ব্যবস্থা করত। খুসী হলে বাড়ীর দরজায় দু'ঘণ্টা গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখতাম।

কেশব চুপ করে থাকে।

ললনা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, দাম নিলাম না, বিক্রী হলাম কিসে? দাম ছাড়াই কিছু বিক্রী হয় নাকি?

এতক্ষণে এবার কেশব মুখ খোলে।

: একদিন নাম হবে, টাকা হবে এই আশায়—

তার কাছে এতটা জ্ঞান বুদ্ধি ললনা বোধ হয় প্রত্যাশা করে নি। রেগে ওঠার জন্য লজ্জা বোধ করে শান্ত সুরে বলে, সে আশা থাকতে পারে। নামের জন্য টাকার জন্য লড়াই করলে নিজেকে বিক্রী করা হয় নাকি? একেবারে নতুন হলেও সহজে নাম আর টাকা করার সুযোগ আমার আছে। গাইতে তো জানি? রং একটু ময়লা কিন্তু পর্দায় তাতে আসে যায় না। গড়ন আমার ভালই, আপনিও তো মাঝে মাঝে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। ওদের সর্ত্ত মেনে নিলে ওরাই আমাকে ঠেলে আকাশে তুলে দেবে। তাতে আমারও লাভ, ওদেরও লাভ। আমি তা করিনি, নিজেকে বিক্রী করার মেয়ে আমি নই।

ললনা যেন নরম হয়ে অভিমানের সুরে কৈফিয়ৎ দেয়, নিজের সাফাই গায়। টের পাওয়া যায়, যত জোর গলাতেই সে ঘোষণা করুক যে সিনেমায় নিজেকে বিক্রী করেনি, নিজের মনেই তার খটকা আছে।

যতদিন প্রচুর আয় ছিল অনিমেষের, বিলাসিতা না থাকলেও সুন্দর মার্জ্জিত জীবনযাপন চলছিল বিনা বাধায় ও নির্ভাবনায়, ততদিন গান নিয়ে সভাসমিতি নিয়ে অনায়াসে মেতে ছিল ললনা। সিনেমা জগতের কোন আকর্ষণ ছিল না।

সিনেমা জগৎ নিয়ে শিল্পীর লড়াই চালাবার কোন তাগিদ সে তখন অনুভব করেনি।

আজ মুস্কিলে পড়ে দরকার হয়েছে এই লড়াই সুরু করা। কিছুটা আত্মসমর্পণ কি করতে হয় নি? এতদিনের নীতি আর আদর্শের সঙ্গে খানিকটা আপোষ!

কিন্তু বলার কিছু নেই। অবস্থা বদলে গেলে মানুষ নতুন ব্যবস্থা করবে, তাতে দোষেরও কিছু নেই। এইটুকু স্বীকার করতে না চাওয়াটাই বিশ্রী অভিমানের পরিচয়।

ললনা বলে, একটু আস্তে চালান। এমন জরুরী কাজ নয় যে আমাদের দু'জনকে মরতে হবে।

কেশব স্পিড অর্দ্ধেকেরও কম করে দিলে ললনা হেসে বলে, আস্তে চালালে বেশী সময় কথা বলতে পারব। বাবাকে নাকি আপনি সেদিন মারতে চেয়েছিলেন? বাবা বললেন রোগের জ্বালায় আপনার দুঃসাহসের ঝোঁক আছে, এলোপাথারী গাড়ী চালিয়ে বাবাকে সঙ্গে নিয়ে মরার ঝোঁক চেপেছিল।

কেশব গাড়ীর গতি আরও মন্থর করে দিয়ে বলে একটা কথা বলব রাগ করবেন না?

ঃ কথাটা তো শুনি। তার পর ঠিক করা যাবে রাগ করব কিনা। আমি রাগ করলেই বা আপনার কি এসে যায়?

সহরের শেষ প্রান্ত। এবার সহরতলী সুরু হবে। সহরের অংশ অথচ খাঁটি সহরের তুলনায় ঘরে দুয়ারে দোকান পাটে সহরের চাপা দেওয়া দৈন্য যেন প্রকট হয়ে আছে।

তবু গাড়ীর কি ভিড় মোড়ে।

পুলিশের নির্দ্দেশে গাড়ী থামিয়ে কেশব বলে, আপনার বাবার বুদ্ধি বিবেচনা কম। সংসারের সোজা নিয়মকানুন বোঝেন না।

ঃ মানে?

ঃ আপনাকে একজন অপমান করতে চেষ্টা করেছিল, উনি গর্জ্জন করে উঠলেন। তার পর ঝিমিয়ে গেলেন। ভয় পেয়ে গেলেন।

কেন, আবার উনি গর্জ্জন করে উঠতে পারতেন না যে একটা বজ্জাত তার মেয়েকে বাগাতে না পেরে তার ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ছে—এ অন্যায় বরদাস্ত করা চলবে না ?

: আপনি দেখেছি সব জানেন।

: জানি বৈকি।

: বাবার শরীর খুব খারাপ, তা জানেন ? সারাজীবন খেটে খেটে বাবা আমাদের জন্যই—

পুলিশ হাত তোলা মাত্র কেশব সশব্দে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে ইলেকট্রিক হর্ণটা চেপে রেখে আগের গাড়ী কটাকে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে জোরে গাড়ী চালায়।

ললনা ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বলে, আমার নিয়ে স্যুইসাইড করবেন ? আমি তো কোন ক্ষতি করি নি আপনার !

মনে মনে কেশবের হাসি পায়। ষ্টিয়ারিং হুইলে একটু গলদ আছে, সেটা মারাত্মক হতে পারে অনায়াসেই। কিন্তু গলদটা তার ভাল করেই জানা আছে, দু'আঙ্গুল বাঁচান রেখে সে গাড়ী লরী মানুষ লেম্পপোষ্ট ঘেঁষে গাড়ীটাকে চড়া স্পিডে নিরাপদে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ললনা বার বার স্যুইসাইড করার কথা বলছে কেন ? আপিস ফেরত অনিমেষকে নিয়ে সে নাকি স্যুইসাইড করতে চেয়েছিল। আজ ললনাকে নিয়ে তার নাকি স্যুইসাইড করার ঝোঁক চেপেছে। আত্মহত্যা করার কথা স্বপনেও তার মনে আসেনি। এরা বাপে বেটিতে সিদ্ধান্ত করেছে যে মাথায় তার বিকার আছে সে আত্মহত্যা করতে চায়।

সহরতলীর সোজা রাস্তা।

গাড়ীর স্পীড চরমে চড়িয়ে কেশব হাল্কা সুরে বলে, আসুন না দু'জনে আমরা একসঙ্গে মরে যাই? আপনি রাজী হলেই আমি এমন করে অ্যাকসিডেণ্ট ঘটাব যে আপনিও টের পাবেন না আমিও টের পাব না কি করে মরলাম। একটুও কষ্ট হবে না।

তরতর করে পিছনে সরে যাচ্ছে টেলিফোন টেলিগ্রাফ বিদ্যুতের তার লাগানো থামগুলি, ইটের বাড়ী, কারখানা, খোলার বস্তি ফাঁকা জমির টুকরোগুলি।

ললনা শান্ত কণ্ঠে বলে, প্রায় এসে গিয়েছি। ওই বাগান বাড়ীটা আমার ষ্টুডিও।

গাড়ী থামাতে গিয়ে চাকায় ব্রেক কষার আর্তনাদ ওঠে।

ললনা রেগে বলে, পরের গাড়ী, মায়া না-ই রইল। একটু বিবেচনা তো করতে হয়!

ললনা নেমে যায়।

কেশবও নামতে নামতে বলে, একমিনিট—কথা শুনে যান, অপবাদ দেবেন না।

: তাড়াতাড়ি বলুন, দেরী হয়ে গেছে।

কেশব গম্ভীর মুখে বলে, আপনার তাড়াতাড়ি আছে বলেই স্পিডে চালিয়ে এসেছি। আপনি তার মানে ধরলেন, আপনাকে নিয়ে স্যুইসাইড করার ঝোঁক চেপেছে। এতদিন মিছেই কলকাতায় গাড়ী চালালাম? কোথায় স্পিড দেওয়া যায়, কোথায় আস্তে চালাতে হয়, তাও শিখিনি? ব্রেকের আওয়াজ শুনে দোষ দিচ্ছেন, পরের গাড়ী বলে মায়া নেই, স্পিডের মাথায় ঘ্যাঁচ করে থামিয়েছি। ব্রেকটার দোষ আছে সে খবর রাখেন? খুব জোরে ব্রেক কষলেই বরং আওয়াজ উঠত না।

ললনা বলে, তাই নাকি!

কেশব বলে, ওই পোষ্টটার কাছে ব্রেক কষেছি, এখানে গাড়ী থেমেছে। গাড়ী হঠাৎ থামালে আপনি হুমড়ি খেয়ে পড়তেন না? যে স্পিডে আসছিলাম তাতে ব্রেক দিয়ে এর আদ্দেক যায়গায় থামালে গাড়ীর ক্ষতি হয় হয় না। বিশ্বাস না হয়, যারা জানে তাদের জিজ্ঞাস করবেন।

ললনা তাড়াতাড়ি বলে, না না, জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই, আপনার কথা বিশ্বাস করছি—

হাত ঘড়িটার দিকে এক নজর তাকিয়ে সে আবার বলে, কি জানেন, আপনার মধ্যে কেমন একট মরিয়া বেপরোয়া ভাব এসেছে। কি হয়েছে আমি জানি না কিন্তু আপনার ভাবটা বেশ বোঝা যায়। স্যুইসাইড করার কথা বাবা বলেছিলেন, আপনার ভাব দেখে আমার মনের খটকা লেগেছে। ব্রেকের আওয়াজ শুনে ভেবেছি আপনি বুঝি ঝোঁকের মাথায় ব্রেক কষেছেন।

ললনা প্রাণপণ চেষ্টায় একটু হাসে, আর দাঁড়াতে পারছি না। পরে কথা বলব।

বড় ম্লান মনে হয় ললনার হাসি। এতক্ষণ নিজের ভাবে মসগুল ছিল, খেয়াল করেনি। ললনার মুখেও ক্লিষ্টতার ছাপ।

তার অসুখের একটা আক্রমণ হয়ে যাবার পর যেমন কৃশতা বিবর্ণতার ছাপ পড়ত তার মুখে।

দশ বার দিন ললনাকে সে চোখেও ছাখে নি।

কে জানে কি ঘটে গেছে এর মধ্যে?

জোরে পা চালিয়ে গিয়ে কেশব তার নাগাল ধরে। বাগান বাড়ী—ষ্টুডিয়োর নতুন খোয়া বিছানো পথে তার পাশে হাঁটতে

হাতে কেশব ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে, অসুখটা আবার হয়েছিল নাকি ?

ললনা গা-ছাড়া ভাবে সায় দিয়ে বলে, হ্যাঁ। নিয়ম টিয়ম সব চুলোয় গেল, চিকিৎসা বন্ধ হল, হবে না ? ভাল করে সেরে উঠতে পারিনি তো। কত কালের অসুখ—সারতে সময় লাগবে না ?

কেশব প্রায় হাত ধরে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু কখনো কোন অবস্থায় একমুহূর্তের জন্যও সে ভুলতে পারে না কিনা যে ললনা মায়া নয়, তাই সামলে যেতে পারে।

মিনতি করে বলে, একটু দাঁড়ান, আধ মিনিট।

: সব মাটি করবেন।

কেশব সময় নষ্ট করে না, সোজাসুজি প্রশ্ন করে, ও অসুখটি আপনার, মেয়েদের গান শেখান, সিনেমা করেন—তবু সভা করে বেড়ান কেন ? ডাক্তার না বারণ করেছিল ? কি দরকার সভায় যাবার ?

ললনা ধীরে ধীরে বলে, দরকার আছে বলেই যাই। শুয়ে থাকার জন্য তো অসুখ নয়, সভায় গেলে বুকে বরং জোর পাই। কি অবস্থা বলুন তো দেশের ? এমন কঠিন অসুখটা আমার সারানো যায় জানা গেল কিন্তু ভাল করে সেরে উঠবার সুযোগ পেলাম না। দেশের অবস্থাটা বদলানর জন্য ওসব সভা হয়, তাই আমি যাই, গান গাই।

মস্ত একটা দামী মোটরকে পথ ছেড়ে দিতে তাদের পাশে সরে যেতে হয়।

গাড়ীর ড্রাইভারের পোষাকে কি জাঁকজমক !

আরাম আর আলস্যের জীবন্ত প্রতীকের মত গাড়ীর মোটা ভুঁড়িওলা মালিক আড় চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে যায়।

ললনা বলে, উনি মালিক।

কেশব বলে, ও ব্যাটা চুলোয় যাক। আপনার কথা বলুন। রোজগার তো করছেন কিছু কিছু। যেটুকু না হলে নয় তাই রোজগার করে চিকিৎসাটা চালিয়ে গেলে হত না? সভাটভায় সময় নষ্ট না করে, শুধু ওষুধপথ্যের পয়সাটা রোজগার করে?

: তা হয় না। ওটা অনেক বড় লড়াই।

: বড় লড়াইটা ভালভাবে করার জন্যই দুদিন ঢিল দিয় অসুখটা সারাবার জন্য লড়াই করতেন?

হঠাৎ যেন বেশী পরিমাণে লোকজন ছুটোছুটি করে, আসা যাওয়া সুরু করে, ষ্টুডিওতে যে একটা উৎকট রকম চাঞ্চল্য এসেছে ত্রিশ গজ দূরে দাঁড়িযে এখন থেকে টের পাওয়া যায়। হঠাৎ যেন অত্যধিক চঞ্চল হয়ে উঠেছে ষ্টুডিওটা। তবে সেটা সত্যিকারের কর্ম্ম-চাঞ্চল্য অথবা জমকালো গাড়ীর আরোহীটির জন্য কর্ম্ম করার চাঞ্চল্য দেখানো সেটা অবশ্য সহজেই টের পাওয়া যায়।

কেশব বুঝতে পারে, মালিকও জানে যে এই কর্ম্ম ব্যস্ততাটা লোক দেখানো. তাকে দেখানো ফাঁকবাজি শো।

কিন্তু এটাই যেন সে চায়—ফাঁকিতেই যেন সে খুসী।

গাড়ী বারান্দায় একটা সিনের সেট করা হয়েছিল। গাড়ী বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সে যেন হাসিমুখে রীতিমত একটা বক্তৃতা ঝেড়ে দেয় যে বেশী খাটুনি নয় ছবিটির আর্টিষ্টিক কোয়ালিটির দিকে যেন সব সময় সকলের নজর থাকে।

ললনা মুখ বাঁকায়!

ষ্টুডিওতে হাজিরা দেবার তাগিদ যেন তার ফুরিয়ে গেছে। আর তাড়াহুড়ো করবার প্রয়োজন নেই।

একবার সে হাই তোলে।

কেশব বলে, আপনার তাড়াতাড়ি, এখন বরং থাক। গাড়ী নিয়ে ওয়েট করছি, আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। তখন কথা হবে।

ললনা বলে, আর আমার তাড়া নেই। আপনি আধঘণ্টা ধরে জেরা করুন। ওব্যাটা এসেছে মানেই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কাজ আরম্ভ হবে না। শুটিং ঠিকমত এগোচ্ছিল না, নিজে ব্যাপারটা বুঝতে এসেছে। দু'চারজন আজ বরখাস্ত হবে।

কেশব চমৎকৃত হয়ে বলে, বটে?

ললনা হাসে।

ঃ কোন দু'চারজন জানেন! ডিরেক্টর বাগচী বাবু যাদের ওপর চটেছেন। আমাকেও হয় তো—

ললনা আবার হাসে।

এখনো সে যেন সাফাই গাইবার চেষ্টা করছে যে নিজেকে সে সিনেমার হাটে বিক্রী করে নি। সে কারো মন যোগায় না, সে লড়াই করে। বাগচী বাবু তার ওপর খুসী নন, হয় তো আজকেই তাকে বরখাস্ত করে দিতে পারেন!

মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল কেশবের। সে জিজ্ঞাসা করে, চিকিৎসাটা চালানো যায় না!

ললনা বলে নাঃ। দেশশুদ্ধ লোক বিনা চিকিৎসায় মরছে, আমি কেন রেহাই পাব বলুন!

এতক্ষণ ললনা একটিও বড় কথা বলেনি। দেশের অবস্থা বদলা'বার জন্য যে সব সভায় গিয়ে সে যে বিপ্লবের গান গেয়ে মানুষকে মাতিয়ে দেয়, সেটা যেন সে করে তার নিজের স্বার্থে! মুখ ফুটে যেন তার বলে দেবার দরকার ছিল যে মনে প্রাণে সে দেশের দুর্দশার অবসান চায়।

তার কঠিন অসুখ। চিকিৎসা চালিয়ে তার আরোগ্য লাভ সম্ভব হ'লেও দেশের অবস্থা না বদলালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়! তার নিজের অসুখ, আর দেশের অবস্থার যোগাযোগের কথাই সে বলে এসেছে, এইবার বোধ হয় সে প্রথম উল্লেখ করল দেশের লোকের বিনা চিকিৎসায় মরার কথা।

কথা এড়িয়ে যেতে চায় ললনা! সবার ছকে আঁটা বক্তৃতা করার কায়দায় তার প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে চায়!

কেশব তাই কড়া সুরে প্রশ্ন করে. বাজে খরচা একটু কমিয়ে, সস্তা শাড়া পরে—

পরনের সেকেলে দামি শাড়ীটার দিকে চেয়ে ললনা হাসে।

ঃ এটা আমার মার শাড়ী। পয়সা দিয়ে কিনি নি। এমন শাড়ী কেনার পয়সা কোথায় পাব!

কেশব হতভম্বের মত চেয়ে থাকে।

তার মায়ের শাড়ীটার দিকে তাকাচ্ছে না স্থানে স্থানে পোকায় কাটা শাড়ী জড়ানো তার দেহটার দিকে তাকাচ্ছে বুঝতে না পেরে ললনা এবার রেগে যায়।

বলে, সস্তা শাড়ী পরে সিনেমা ষ্টুডিওতে আসা যায় না, এটুকু সহজ বুদ্ধিও আপনার মগজে গজায় না! এদের দেওয়া সোনা রূপার জড়ি বসানো হাজার টাকার শাড়ী পরে ষ্টুডিওতে এলে বুঝি খুসী হতেন! তাহলে কিন্তু আপনাকে পৌঁছে দেবার জন্য তোষামোদ করতাম না—এদের গাড়ী আমায় নিয়ে আসত।

কেশব টের পায়, ললনা তার সঙ্গে লড়াই করছে।

এতক্ষণ সাফাই গেয়েছিল। এবার তাকে আক্রমণ করেছে।

বিড়ির কৌটায় দুটো আস্ত সিগারেট ছিল, একটা সিগারেট ধরিয়ে

কেশব ধীরে ধীরে বলে এবার তবে যাই। হয় তো আর দেখাই হবে না। আমার অসুখটা আমি সারাবই।

ললনার রাগ হয়েছিল।

সে বলে, আপনার অসুখটা নিয়ে জগৎ চলে ভাবেন বুঝি?

কেশব বলে তাহলে কি আপনার অসুখটা নিয়ে জগৎ চলে?

দু'জনে বাকাহারা হয়ে থাকে।

যাই বলেও কেশব যেতে পারে না। এভাবে কি বিদায় নেওয়া যায় ললনার কাছে?

বাগান বাড়ীর সমস্তটায় ছড়িয়ে। প্রাচীন দীঘি আর পাম-গাছের রাশি, কেয়ারি করা ফুলের বীথি, কোনায় ফেলে দেওয়া মালিদের ভাঙ্গা কুঁড়েঘর কত ছবিতে কত দৃশ্যে যে ঠাঁই পেয়েছে—কত যে কমিয়ে দিয়েছে ছবি তোলার হাঙ্গামা আর খরচ।

কিন্তু কেন্দ্রটা ওই দালান বাড়ীতে। ভাগ্যে একজনের বহুকাল আগে ইংরেজের সহরে দেশী বিলাতি মিশেল করা আধুনিক সভ্য জীবন যাপন করতে হাঁপ ধরত, মাঝে মাঝে বন্ধু-পারিষদ আর বেশ্যা নিয়ে হাঁপ ছাড়ার জন্য বাগান বাড়ীটা তৈরী করেছিল।

সিনেমা তৈরী অনেক সহজ হয়ে গেছে তার কল্যাণে।

ক্ষমা চাওয়ার সুরে নয়, সহজ বাস্তব একটা সত্যকে প্রকাশ করার সহজ সুরে কেশব বলে, আমি খুব বাড়াবাড়ি করে ফেললাম বরাবর প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, আপনাকে তাই সয়ে যেতে হল। অন্য কেউ হলে গালে চড় কষিয়ে দিত।

ললনাও সহজ সুরে বলে, আপনি ভারি চালাক। রাগারাগি হওয়ার সব দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। বরাবর প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি, কাজেই আপনার কোন দোষ নেই। আমি কিন্তু আপনাকে

কোনদিন প্রশ্রয় দিইনি, দেবার দরকারও হয়নি আপনি বরাবর সংযত থেকেছেন, মানিয়ে চলেছেন।

কেশব বলে আপনি যখন সিনেমায় ঢুকেছেন, আর সংযম রাখব না, মানিয়ে চলব না।

ললনা নিশ্বাস ফেলে বলে, আপনি বুঝবেন না। আপনি শুধু বাইরে থেকে দেখছেন আমাদের। কমলদা'র চিকিৎসা বন্ধ হয়ে গেছে খবর রাখেন? বাবা দিদিকে জানিয়ে দিয়েছে আর টানতে পারবে না। ডাক্তার দত্তের চিকিৎসা বন্ধ করে সেই পুরাণো চিকিৎসাই করা হোক। দিদি বিছানা নিয়েছে, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে শুধু কাঁদছে। অনিলবাবু কাকাদের রাগ ভাঙ্গাতে ছুটে গেছেন। রাগ ভাঙ্গবে কিনা, পুরাণো চিকিৎসাটাও কমলদা'র জুটবে কিনা ঠিক নেই।

: ডাক্তার দত্ত—!

: তাই তো বলছিলাম আপনি আমাদের বাইরেটাই শুধু দেখেছেন ভেতরের খবর জানেন না। ডাক্তার দত্ত টাকা চান না, ট্রিটমেণ্ট চালিয়ে যেতে রাজী আছেন। কিন্তু তাই বলে অন্য খরচগুলিও কি তিনি নিজের পকেট থেকে দেবেন!

ললনা সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকায়। প্রাচীন বটগাছটার পাতার ফাঁক দিয়ে তার মুখে এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে।

: আপনি বাবাকে বোকা বলছিলেন। আগে হলে আপনার গালে আমি চড় বসিয়ে দিতাম। আমি নিজেই বাবাকে বোকার বেহদ্দ বলে জেনেছি তাই বাপ তুলে গাল দিয়ে রেহাই পেয়ে গেলেন। বাবা সত্যি বোকা। দুটো পয়সা রোজগার করেছে, ভেবেছে আমি মস্ত বাহাদুর। কিভাবে পয়সা কামিয়েছে সেটা কোনদিন ভাবে

নি। শেষ পর্যন্ত টানতে পারবে না, কি দরকার ছিল কমলদা'র চিকিৎসার দায় ঘাড়ে নেবার? ওর আপনজনদের চটিয়ে বাহাদুরী করার? মাঝখানে থেকে কমলদা'র একূলও গেল ওকূলও গেল।

: তার মানে সারবার উপায় আছে তবু কমলদা ও আরোগ্য হবেন না?

দেখি চেষ্টা করে—সিনেমায় গান গেয়ে যদি দিদির সর্বনাশ ঠেকাতে পারি।

দেখা যায় ললনার অনুমান সত্য নয়। মালিকের আবির্ভাবে এক ঘণ্টা কাজ বন্ধ থাকার বদলে শুটিং সুরু হয়ে যায়।

ললনা বলে, কত সহজ হয়ে গেছে ছবি তোলা।

তাই বটে। দূর থেকে কাছ থেকে ওদিক থেকে দীঘিটা দেখাতেই কত ফুট ফিল্ম কাজে লেগে যায়—সুন্দরী একটা মেয়েকে প্রকাণ্ড ভাঙ্গা ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে আঁকা বাঁকা করে নামিয়ে জলে চুবিয়ে ভঙ্গিহীন সিক্ত বসনে উঠিয়ে এনে কত ফিট ফিল্ম সার্থক হয়।

মুচকি হাসি চাপতে, রোগা লেপাপোঁছা শরীরটার নানা রকম ভঙ্গি আর ঢং সামলাতে সামলাতে মাস্তানটা এসে অতি কষ্টে তোতলিয়ে ললনাকে বলে, আপনাকে ডাকছে।

ছবি তোলা দেখার বদলে কেশব তাকিয়ে থাকে যে লোকটি তাদের দিকে এগিয়ে আসছিল তার দিকে।

সর্বাঙ্গে তার অবিরাম ঘটে চলেছে এলোমেলো নড়ন-চড়ন, ঠোঁট কাঁপছে চোখ মিটমিট করছে আর মাথাটা যেন ভিতরে ধাক্কায় চমকে চমকে নড়ে উঠছে।

ঃ ই—ইনি··· ? ই—ইনি··· ?

ললনা বলে, ইনি আমার বন্ধু।

সে বোধ হয় ভদ্রতার হাসি হাসবার চেষ্টা করে। হাতের আঙ্গুল থেকে গরীবের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরামহীন নড়ন-চড়নে যেন নতুন একটা বিশৃঙ্খলা, নতুন একটা অসামঞ্জস্য সংঘটিত হয়।

তোতলিয়ে তোতলিয়ে কতগুলি ভাঙ্গা শব্দ ও সে উচ্চারণ করে।

কথাগুলির মানে কেশব বুঝতে পারে। ভেতরে যাবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তফাতে সরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা এতক্ষণ কথা বলছে, তাকে বাদ দিয়ে একলা ললনাকে ডাকবার সাহস ষ্টুডিওর কর্ত্তাদের নেই। ললনা হয়তো রেগে যাবে, হয় তো বর্জ্জন করবে ষ্টুডিওর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক।

ঝাল মশলা হিসাবে ললনাদের খানিক খানিক না মিশিয়ে শুধু পেশাদার ষ্টারদের দিয়ে আর জমানো যাচ্ছে না জনসাধারণের পয়সায় সিনেমার আসর।

ললনার মুখের দিকে একনজর তাকিয়ে কেশব একটু হেসে মাথা নেড়ে গেটের দিকে চলতে সুরু করে।

এগারো

মনের দুটো জগৎ ওলট পালট হয়ে গেল। কিন্তু যন্ত্রণা কই ?

বরং দেহ মন যেন শান্ত হয়ে গেছে তার। সুন্দর হোক কুৎসিৎ হোক সত্যের সন্ধান পেয়ে যেন তার পরম মুক্তি জুটেছে। মায়ার ওপর ললনার ওপর বিতৃষ্ণা আরও আগুনের মত জ্বলে ওঠার বদলে যত বিরাগ আর বিতৃষ্ণা ছিল সব নিভে গিয়ে মমতা বেড়েছে।

নিজের মনে সত্যই কেশ তাজ্জব বনে যায়।

খসে গেছে মায়ার ফাঁকির মুখোস, ধরা পড়ে গেছে যে তার মায়ের বাড়া দরদ' স্বেচ্ছায় সাগ্রহে বিনা পয়সায় কেনা ক্রীতদাসীর চেয়েও পোষ মেনে তার জন্য মরণ বাঁচন পণ করা, তার ভীরুতা, কোমলতা, ব্যাকুল গভীর ভাবাবেগ— এসব মিথ্যা আসল নয়।

সে নিজের সুখ আর সার্থকতাই চায়, পার্থিব সুখ আর সার্থকতা। আর কোন উপায় নেই বলে, এ জীবনে অন্য কারও কাছে আরাম বিলাস গিন্নিপনার সাধ মিটাবার সম্ভাবনা নেই বলে, তাকে মায়ার ফাঁদে ফেলে তাকে নিয়ে তার উপার্জনে বাকা জীবনটা একটু সার্থক করার সাধটাই মায়ার আসল।

বার বার সে মায়াকে জানিয়ে দিয়েছে সে ঘরে ঘরে ছোট বড় সংসারে সে শুধু দেখেছে সস্তা সুখের লোভ, ফাঁকি আর হীনতা, দীনতা, দুঃখ কষ্টে হাবুডুবু খেতে খেতেও মনকে চোখ ঠেরে কোন মতে বেঁচে থাকার ধোঁকাবাজিতে সুখী থাকা।

এরকম সংসারকে সে ঘেন্না করে। বৌ নিয়ে এরকম সংসারের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার কথা ভাবলেও গা গুলিয়ে তার বমি আসে।

লেখাপড়া ছেড়ে তাই সে বখাটে হয়েছে। কেরানী হবার বদলে হয়েছে মোটর ড্রাইভার।

মায়া তবু আশা ছাড়েনি।

মায়া তবু প্রাণপণে চালিয়ে এসেছে মায়ার ফাঁদ পেতে তাকে বাগাবার চেষ্টা।

কাল গেল মায়ার এই মুখোস খোলার পালা।

আজ সমস্ত শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতির জৌলুস হারিয়ে গান গেয়ে সভায় হাজার মানুষের মধ্যে আলোড়ন জাগাবার মহত্ত্ব হারিয়ে, রুচি রূপ হাসি গান আনন্দের আবরণ খসিয়ে আরেকটি মায়ার

মতই ললনা গেল সিনেমায় সস্তা গান গাইতে। কেশব আজ টের পেয়েছে, মায়া আর ললনা একেই মিথ্যার এপিঠ আর ওপিঠ।

মায়া থাকে ডোবা পুকুর বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে আর ললনা থাকে আলোয় ঝলমল রেডিও আর মোটরগাড়ার হর্ণে উচ্চকিত লন-ওলা সুন্দর সাজান বাড়ীর পরিচ্ছন্ন পাড়ায়। মা বাপ ভাই বোন ভগ্নীপতির সুবিধা হচ্ছে না বলে ললনা অগত্যা সিনেমায় ঢুকে লড়াই সুরু করেছে তাদের জগতটা পাল্টে দেবার জন্য।

কিন্তু তার নিজের দিকের হিসাবটা তবে কি দাঁড়ায়?

মায়া আর মায়ার জীবন ও জগতকে ভালবেসেও সে রাত্রির অন্ধকারে মায়াকে ভোগ দখল করেছে, তাকে বাঁধবার জন্য মিথ্যা মায়ার ফাঁদ পেতেছে জেনেও সে তো মায়াকে এড়িয়ে যায়নি, এতটুকু রেহাই দেয়নি মায়াকে।

ললনা আর তার জীবন ও জগতের টানে মাঘের হাড় কাঁপানো শীতের রাত্রি শেষেও ডোবায় ডুব দিয়ে প্রস্তুত হয়ে সে সাগ্রহে ছুটে গিয়েছে অনিমেষের গাড়ী চালানোর চাকরি করতে।

দিনের শেষে সহরের আলোকময় রাত্রি সুরু হতে না হতে সে অবশ্য ব্যাকুল হয়ে উঠতে সুরু করেছে মায়া আর চাঁদ ও তারার বেশী আলোয় আঁধার করা জগতটায় ফিরে যাওয়ার জন্য—কিন্তু কত তুচ্ছ কারণে, ললনার সামান্য একটু প্রয়োজনে, বছরের কত রাত তার কেটে গিয়েছে সহরেই।

কান্নুর সঙ্গে দু'এক চুমুক দেশী মদ খেয়ে কতদিন সে মায়াকে অগ্রাহ্য করে সোজাসুজি ঘরে গিয়ে এক ঘুমে রাত কাটিয়েছে।

ব্যাকুল মায়া একটা ছুতো করে বাড়ীতে এসে মেয়েদের সঙ্গে

কথা বলছে—সে টের পেয়েও উঠে যায় নি, মায়া কে ভরসা দেয়নি, যে আমি ঠিক আছি, ভেবো না।

মায়াকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে পেয়েছে বলেই কারণে অকারণে তুচ্ছও করতে পেরেছে তার আকর্ষণ কিন্তু সে মনে করতে পারেও না কবে কোন্ গুরুতর কারণে ভোররাত্রে উঠে সহরে চলে যায় নি।

ললনা আর তার জীবন ও সংগীতের টান, একটা দিনের জন্যও এড়িয়ে যেতে পারে না।

জ্বর এসেছে।

কাঁথার তলে সারারাত কেঁপে কেঁপে আর কাতরেছে।

ভোর রাত্রে উঠে ডোবার ঘাটে গিয়ে স্নান না করলেও নাকে কানে কপালে জল ছুঁইয়ে নিয়ম পালন করেছে, জ্বরের মাথাটা গামছা চুবিয়ে চুবিয়ে জল ঢেলে ধুয়ে ফেলেছে।—সহরে যাত্রা করার জন্য।

ললনার জীবনের বিশ্রী বাজে দিনগুলি, বাপের মোটা বেতন এবং সকলের জানিত ও স্বীকৃত মোটা উপরি আয়ের পয়সায় জীবনটা সুন্দর করার উজ্জ্বল করার চেষ্টাগুলি মাঝে মাঝে মনটাকে বিগড়ে দিয়েছে বটে কিন্তু বরাবর সে তাকে মনপ্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করে এসেছে জানাচেনা রক্তমাংসের আদর্শ নারীত্বের প্রতীক হিসাবে। ললনার চেয়ে অনেক ভাল অনেক বড় অনেক খাঁটি মেয়ে জগতে হয়তো অনেক আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে কেশবের পরিচয়টাও প্রায় তুচ্ছ।

ললনার চেয়ে তারা হাজারগুণ মহীয়সী হলেও তার কাছে তারা নিছক কাল্পনিক জীব।

বাড়ীতে ললনার গান অভ্যাস করার একঘেয়ে প্রক্রিয়াটা পর্য্যন্ত সে বরাবর মন দিয়ে শুনে এসেছে—এক ঘেয়ে লাগার বদলে মুগ্ধ হয়ে থেকেছে।

দশ বিশ হাজার লোকের সভায় সেই গান শুনে তার মনে হয়েছে যেন নতুন গান শুনছে—এই দশ বিশ হাজার লোকের মত তাকেও মাতিয়ে দেবার রাগিয়ে দেবার, রোগ শোক দুঃখ দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে লড়াই করার রোমাঞ্চকর সাধ জাগাবার নতুন গান।

ললনার অসুখটার আক্রমণ হলে একটু বাতাসের জন্য তাকে দারুণ কষ্টে ছটফট করতে দেখে তার মনে হয়েছে, মরে গিয়ে নিজের জীবন দিয়ে সে যদি কষ্ট একটু লাঘব করতে পারত ললনার!

সেই ললনা সিনেমায় ঢুকেছে পয়সার জন্য!

বাপের অনেক আয় ছিল, সে আয় হঠাৎ কমে যাওয়ায় দশ বিশ হাজার মানুষের সঙ্গে তাকেও মাতিয়ে জাগিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলার সাধনাটা তুচ্ছ হয়ে গেছে ললনার কাছে।

তার রক্তমাংসের একমাত্র জীবন্ত দেবী সত্তা সিনেমায় ভিড়ে গেছে পয়সার দরকারে।

কিন্তু তার রাগ হচ্ছে কই?

মায়া বা ললনাকে দোষী বা ছোট ভাবতে পারছে কই ঘৃণা করতে পারছে কই?

ঘৃণা বা বিতৃষ্ণা জাগার আর সম্ভব নয়। তার কাছে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আসল সত্যটা।

দোষ ওদের নয়।

মন্দ জগতের মন্দ নিয়ম খাটছে তাদের জীবনে, তারা কি করবে?

সিনেমায় ঢোকার সুযোগটা গ্রহণ করার জন্য পাগল হয়ে মোহিনী যে পালিয়ে গিয়েছে সেজন্য সে তাকে দোষী করে নি, সবদিক দিয়ে দায়ী ভেবেছে ভুবনকে।

আজ ভুবনকে পর্য্যন্ত দায়ী ভাবতে পারছে না। শত দোষ করে

থাক ভুবন, হীনতা ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতার অন্ধকারে যতই ভরাট হোক তার মন—তার মানসিক অবস্থাটা যে কায়েম করে রেখেছে অন্যেরা এই বাস্তব সত্যটাকে মেনে নিলে দায়ী তো তাকে কোনমতেই করা যায় না।

মনের অন্ধকারের জন্য দায়ী যদি সে না হয়, তাকে ছোট ভাবার ঘৃণা করার অধিকারও তো এ জগতে কারো থাকতে পারে না!

মোহিনীর মত রূপসী বৌকে দিনরাত পুলিশের মত পাহারা দেবার তাগিটা তার জন্মগত দুর্বলতা নয়, জগতের সব চেয়ে অগ্রসর মানুষ হবার অধিকার নিয়ে মানুষ হয়েই সে জন্মেছে। নিজেদের স্বার্থে অন্যের খুসি মাফিক বরাদ্দ করা তার জীবন, গড়ে দিয়েছে তার মতি গতি, সে করবে কি?

মায়া যদি লাথি ঝাঁটা বাখারির মার সব সয়ে সয়ে যাওয়াই সংসারের নিয়ম বলে জানে, নিয়ম পালন করার জন্য তাকে অমানুষ বলা চলে কোন যুক্তিতে? তার ভালবাসাকে অবলম্বন করে জীবনটা একটু সার্থক ও সুন্দর করার লড়াই যদি সে নিজের জানা নিয়মে করেই থাকে, কি বলে তাকে দোষ দেওয়া যায়?

প্রয়োজন যদি বাধ্য করে থাকে ললনাকে সিনেমায় সস্তা গান গাইতে,—মারাত্মক রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করাটা পর্য্যন্ত যে তুচ্ছ করে দিতে পারে সভার সমাবেশে লড়ায়ের গান গাইবার তাগিদ সে যদি অন্য দিকে অন্য প্রয়োজনের চাপে সিনেমার সস্তা পয়সা তুচ্ছ করার মত মনের জোর নিজের মধ্যে খুঁজে না পায়, তার জানা নিয়ম নীতি অনুসারে যেভাবে গিয়েছে এভাবে সিনেমায় ঢোকা তার কাছে যদি দোষের না হয়—তাকে ছোট ভাবা যায় কি করে?

না, মানুষের জীবনকে যারা ব্যহত ও ব্যর্থ করে রাখে কেবল তাদের ছাড়া সংসারে কোন মানুষকে বাজে ভাবা যায় না, ছোট ভাবা যায় না, ঘেন্না করা চলে না। সংসারের গলদ থাকলে মানুষের মধ্যে গলদ থাকবে না? সংসারে মহৎ মানুষ বীর মানুষ এগোনো মানুষ আছে বলেই হীন মানুষ ভীরু মানুষ পিছোনো মানুষ অমানুষ হয়ে যায় না। জোর করে তাকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে, মহৎ মানুষ বীর মানুষ এগোনো মানুষ হতে দেওয়া হয়নি—এ অপরাধ তাদের নয়। একজনের একটা দোষ আছে বলেই তার গুণটা বাতিল হয়ে যায় না।

ললনার মত আলো পেলেও যাদের চোখে রঙিন কাঁচের চশমা এঁটে দেওয়া হয় জীবনে তাদের মিথ্যা রঙ তো থাকবেই।

মিথ্যার রঙ মেশানো থাক, আলো পেয়েছে বলেই ললনা আসল কথাটাও ধরেছে ঠিক—জগৎটা পাল্টে নিতে হবে, সেজন্য লড়তে হবে।

নইলে অনিয়ম আর অব্যবস্থা ঘুচবে না।

মায়ার জগৎ, তার জগৎ, ললনার জগৎ পাল্টে দিতে হবে।

ঠিক কথা!

ডাক্তার দত্তের চিকিৎসায় কেন ফল হয়নি বুঝতে আর বাকী নেই কেশবের।

যে অনিয়মের জন্য তার রোগ, সেটা রয়েছে সংসারে। সংসারটা না পাল্টালে অনিয়মটা যাবে না। তার রোগও আরোগ্য হবে না।

তার মানেও খুব সোজা। সংসারটা পাল্টাবার লড়াই তাকেও করতে হবে। শুধু নিজের রোগ নিজের সুখ দুঃখের হিসাব নিয়ে মেতে থাকলে কিছুই হবে না কস্মিন কালেও।

দেহমন হাল্কা মনে হয় কেশবের।

অনিমেষের গাড়ী তার বাড়ীতে পৌছে দিয়ে কেশব যায় বীরেশের বাড়ী। বীরেশ রেগেই ছিল। কেশব গিয়ে পৌছতেই সে ধমক দিয়ে বলে, তুমি তো আচ্ছা লোক! বলা নেই কওয়া নেই কামাই করে বসলে?

কেশব বলে, আজ্ঞে অসুখ করেছিল।

বীরেশ আরও রেগে বলে, অসুখ করেছিল! এরকম কামাই করলে তোমায় আমি রাখব না।

কেশব মুখ তুলে কড়া সুরে বলে, সে আপনার খুসি। রাখা না রাখার মালিক আপনি। রাখতে না চাইলে বিদায় দেবেন কিন্তু এরকম ধমক দিয়ে কথা কইবেন না।

বীরেশ তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে যায়। রাগ চাপতে তাকে যে নিজের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতে হচ্ছে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

নতুন গাড়ী কিনেছে, এখনো নিজে চালাতে সাহস পায় না। কেশব বুঝতে পারে, সেটাও তার সংযমের একটা কারণ। চাকরী যে এখানে খতম হয়ে গেল তাতে সন্দেহ নেই। তবে আরেক-জন লোক পাওয়া আগে তাকে বীরেশ জবাব দেবে না।

তার অসহ্য বেয়াদবি সহ্য করে যাবে আরেক জন ড্রাইভার পাওয়া পর্য্যন্ত—অর্থাৎ একদিন কি দু'দিন তার চাকরীর মেয়াদ।

অন্য লোক পেলেই তাকে তাড়াবে, বাকি মাইনেটা দিতে গোলমাল গড়িমাসি করে গায়ের ঝাল ঝাড়বার চেষ্টা করবে।

বীরেশের গায়ের জ্বালা এখনকার মত চেপে যাবার মতলব আঁচ করে কেশব মনে মনে একটু হাসে।

বোধ হয় দশ মিনিটও লাগে না।

নাওয়া খাওয়া আগেই সারা হয়েছিল বীরেশের। মিনিট দশেকেই প্রসাধন সেরে পোষাক পরতে খাওয়ার আগে শুধু একটা আণ্ডার ওয়্যার পরে তাকে বলতে আসে, গাড়ী বার কর।

বাড়ীতে নিজের ও আত্মীয় স্বজনের বয়স্কা আশ্রিতা মেয়ে পাঁচ ছ'টির কম নয়। তিন চার জন তারা কলেজে পড়ে। পোষাক পরার আগে প্রসাধনের সময় বীরেশ সেকেলে ল্যাঙটের চেয়ে বিশ্রী এই আণ্ডার-ওয়্যার পরে অনায়াসে বাড়ীর মধ্যে এদিক ওদিক চলাফেরা করে—গ্রাহ্যও করে না।

কেশব বলে, গাড়ী বার করেছি সার। আপনি রেডি হয়ে আসবার আগেই আমি রেডি হয়ে থাকব। ওষুধ পত্র কিনতে হবে, আজ আমার মাইনেটা দেবেন।

: তুদিন পরে নিও।

: গরীব মানুষ, অসুখ হয়েছে। টাকার বড় দরকার সার। ওষুধ পথ্য না পেলে হয়তো ফের তু'দিন কামাই করে বিছানায় পড়ে থাকব।

: কাল পরশু নিও। চাওয়া মাত্র দিতে হবে এমন কিছু নিয়ম আছে নাকি।

: পরশু মাস কাবার হয়েছে।

তাতে কি হয়েছে? কাল পরশু নিও।

কেশব মনে মনে বলে, তোমার মতলব বুঝেছি। মতলব ভাঁজতে আমিও জানি, টের পাইয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও।

প্রসাধন সেরে দামী পোষাক পরে বীরেশ সিগার ধরিয়ে হেলতে তুলতে বেরিয়ে এসে গাড়ীতে ওঠে।

স্নান করে চুপি চুপি পূজা সেরে খাওয়া দাওয়া সে আগেই চুকিয়ে রাখে।

সায়েবী পোষাকে সিগার টানতে টানতে বেরোয় কিন্তু কেশবের তো অজানা নেই কিছুই।

কপালের বদলে বুকে সে ফোঁটা চন্দনের নক্‌সা আঁটে—রবার ষ্ট্যাম্পের মত তৈরী করা নক্‌সা। তামার পাত্রে ঘষে রাখা শ্বেতচন্দনের বাটার ষ্ট্যাম্পটা ডুবিয়ে ছাপ মারলেই হল—এক মিনিটও লাগে না।

গাড়ী নিয়ে রাস্তায় নেমেই কেশব চাপায় স্পিড।

আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হয় বীরেশের!

: আরে আরে, কি করছ পাগলের মত? চাদ্দিকে গাড়ী এত জোরে চালায়? আস্তে চালাও।

: আস্তেই চালাচ্ছি সার। আপনাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি একটু জরুরী কাজে বেরোব। হাতে একটা পয়সা নেই যে বিড়ি সিগ্রেট কিনি।

: তুমি বাবু আস্তে গাড়ী চালাও, মাইনে আজকেই মিটিয়ে দেব।

: তাহলে ঠিক আছে।

কেশব গাড়ীর স্পিড কমিয়ে দেয়।

আপিসে পৌঁছেই তার মাইনে দিয়ে বীরেশ তাকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করে দেয়।

: বিনা নোটিশে তাড়াচ্ছে, পনের দিনের মাইনে বেশী দিতে হবে সার।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বীরেশ নীরবে আরও পনের দিনের বেতন তাকে দিয়ে দেয়।

অনিমেষের কাছে সে শুনেছিল লোকটার মাথায়·ছিট আছে,—মাথা বিগড়ে গেলে যা খুসী করতে পারে, নিজে বাঁচবে কি মরবে গ্রাহ্য

করে না। সত্যই তো, কি স্পিড চাপিয়েছিল গাড়ীতে! এ্যাক্সিডেন্ট হলে কেবল সে নয়, নিজেও যে মরবে এটা খেয়ালও করেনি। কাজ নেই বাবা, এসব মানুষকে চটিয়ে কাজ নেই।

পনের দিনের মাইনে আদায় করেও কেশব কিন্তু ছাড়ে না।

বলে, আমার বাড়ী যাবার গাড়ী ভাড়াটা সার?

: কত?

: আজ্ঞে মোটে দশ পয়সা।

পরদিন কাক-ডাকা ভোরে কেশব হাজির হয় কানুর বাড়ী। কানুকে তার অসুখ সম্পর্কে সংবাদটা জানাতে হবে। একটা কাজের কথাও বলতে হবে।

কানুর বিয়ে আবার পিছিয়ে গেছে।

কারখানার দুর্ঘটনার জন্য ঠিক করা তারিখে বিয়েটা হয়নি। এই মাসে বিয়ের আরেকটা যে শুভদিন বাছা হয়েছিল তার সাতদিন আগে বেলার ঠাকুমা গেছে মারা।

একমাস অশৌচ যাবে। তারপর মাস দেড়েকের মধ্যে একটাও বিয়ের তারিখ নেই।

তিন মাস পরে যদি হয় তো হবে তাদের বিয়ে।

টিনের ছোট পুরানো বাড়ী। দু'খানা মোটে ছোট ছোট ঘর আর একফালি বারান্দা।

কানু তাকে বারান্দায় বসায়।

ঘরের মধ্যে একটা চেনা মুখকে আড়ালে সরে যেতে দেখে কেশব তাজ্জব বনে যায়।

এত সকালে এ বাড়ীতে বেলা?

কানু একমুহূর্ত্তও ইতস্তত করে না। ডেকে বলে, একটু চা'টা দিতে হয় তো? বন্ধু মানুষ বাড়ী এয়েছে?

ভেতর থেকে বেলার গলা শোনা যায়, মুণ্ডু ধরিয়ে জল চাপিয়েছি গন্ধ পাও না? নাক বন্ধ নাকি? তাড়াহুড়ো করো না, পুড়ে মরলে ভাল হবে?

কেশব তাজ্জব বনে চেয়ে থাকে।

কানু বলে, মুণ্ডু কি জানিস? একটা পেট্রোল ষ্টোভ বানিয়েছি। সিগারেট লাইটার দেখেছিস তো, ছোট্ট জিনিষ, একটা পলতে। একটা বড় ডিবের ছ্যাঁদা করে সাতটা পলতে বসিয়ে দিয়েছি—চট করে জল ফুটে যায়।

ঃ একদিন ফেটে গেলে টের পাবি।

ঃ ফেটে গেলেই হল! অ্যাদ্দিন ঘাঁটছি কারবার করছি, পেট্রলের ব্যাপার জানি না ভেবেছিস্? ইঞ্জিন যদি না ফেটে চলে তবে আমার ষ্টোভও ফাটবে না। তবে হ্যাঁ, এ ষ্টোভে অন্যের সুবিধে হবে না। আমার সব মাগনায় চলে, অন্যের খরচা পোষাবে না। নইলে—

ঃ নইলে?

ঃ নইলে পেটেণ্ট নিয়ে সস্তা পেট্রোল ষ্টোভ বানিয়ে বাজারে ছাড়তাম—বড়লোক হয়ে যেতাম।

বাজারে মাল ছাড়তে হলে কারখানা করতে হয়। টাকা পেতিস কোথায়?

টাকাওয়ালা একজনকে লাভের ভাগীদার করতাম—সে টাকা দিত।

কাঁচের গ্লাস আর টিনের মগে তাদের চা এনে দিয়ে বেলা বলে

বন্ধু এলে খাতির করবে তুমি, আমায় ডাকা কেন? ঘরে না এনেই ঘাড়ে দায় চাপানো ভালো নয়। বন্ধু এবার দফা সারবে, পাঁচজনকে বলে বেড়াবে।

কানু বলে, তেমন বন্ধু নয়। আমি গাড়ী সারাই, ও শালা গাড়ী চালায়।

বেলা বলে, এবার আমি পালাই। চাদ্দিক ফর্সা হয়ে গেছে।

বলে বুনো হরিণীর মত সত্যই সে পালিয়ে যায়!

কেশব বলে, ধঁধা লাগছে যে।

কানু বলে, পষ্ট জিজ্ঞেস করতে পারলি না? ছুটে গিয়ে নাগাল ধরে জিজ্ঞাস কর, ধঁধাঁ মিটিয়ে দেবে।

কেশব চাপ চাপ লাল আটালো গমের আটা সেঁকা রুটি দিয়ে গুঁড়ো দুধের বিশ্রী চায়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খায়, ধীরে ধীরে অনুযোগের সুরে বলে, তুই জানিস না ধাঁধাঁটার মানে?

কানু বলে, ধাঁধাঁ কিছু নয়, সিধে ব্যাপার। চণ্ডীতলায় ওর পিসীর বাড়ী, পিসী ওকে বড্ড ভালবাসে। বাচ্চা বেলায় মার হয়েছিল অসুখ, পিসী মাই দিয়ে বাঁচিয়েছিল। খুসী হলেই পিসীর কাছে যায়, দু' একদিন থেকে আসে। এবার পিসার কাছে যাবার নাম করে আমার বাড়ী বেড়িয়ে গেল।

: রোজ আসে?

: পাগল নাকি তুই? ও হপ্তায় এসে একদিন ছিল, কাল বিকেলে এসে রাতটা থেকে গেল।

কাঁচের গ্লাসের গরম চায়ে চুমুক দিয়ে কেশব বলে, বাড়ীতে নিশ্চয় জানে?

: জানে বৈকি। পিসী পর্য্যন্ত জানে। পিসী কাল একটু পায়েস রেঁধেছিল। বাচ্চাকালে মাই খাইয়েছে, ওকে না দিয়ে তো নিজের রাঁধা পায়েস খেতে পারে না। ডেকে আনতে গিয়ে শোনে মেয়ে নাকি আগের দিন তারই বাড়ী গেছে। পিসী কথাটি না করে সটান এখানে এসে হাজির।

: মা-কে ভাগিয়েছিস বুঝি ?

সোজা কথা বড় বাঁকা বুঝিস। মাকে ভাগাব কেন ? মা গঙ্গায় নাইতে গেছে, খানিক বাদেই আসবে। মা না থাকলে ও আসতো, না, আমিই ওকে খালি বাড়ীতে থাকতে দিতাম ? কাল ওর পিসী এসে এক ঘণ্টা মার সঙ্গে গল্প করে গেল না ? যাবার সময় শুধু একটিবার ডাকলো, বেলা আসবি নাকি ? মা বললে, থাক্, আমি দিয়ে আসব।

কেশব বলে, বটে ! বাড়ীতে কিছু বলে না ওকে ?

কানু বলে কি বলবে ? ভয়ে চুপ করে আছে। চোক কান বুজে দুটো মাস কাটিয়ে দিয়ে বিয়েটা সেরে দিতে পারলে বাঁচে। মেয়ের নেই কেলেঙ্কারির ভয়, বকাঝকা দিতে গেলেই ঝন্‌ঝাট। তার চেয়ে চুপচাপ দু'টোমাস কাটিয়ে মেয়েকে বিদায় করে হাঁপ ছাড়াই ভাল।

কেশব বলে সে তো ভাল বুঝলাম। কেলেঙ্কারির ভয়ে ওরা তোদের ঘাঁটাতে চায় না, দেখেও দেখে না, জেনেও জানে না, কিন্তু তুই যদি শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে না করিস ও মেয়েকে—এ ভয়টা তো আছে ওদের ?

কানু হেসে বলে, না, ওদিক দিয়ে ওরা নিশ্চিন্ত। জানে যে পৃথিবী উল্টে গেলেও আমাদের বিয়ে হবেই হবে।

কেশব আচমকা জিজ্ঞাসা করে, কম্পেনসেসান আদায় করতে পাববি তো ঠিক ?

: করবো না তো কি ছেড়ে দেব ভেবেছিস ? অনেক কম দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা কয়েছিল, আমি কিছুতে ছাড়লাম না। কিছুদিন গোলমাল করে হার মানলো।

কানু কাজে যাবে।

উঠতে গিয়েও সে বসে।

বন্ধুকে আরেকটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা ধরিয়ে বলে, তোকে আজ খুব তাজা দেখাচ্ছে ? দিব্যি হাসিখুসি ভাব। এমন তো দেখিনি কখনো ! ব্যাপারটা কি ?

: আমার রোগ সেরে গেছে।

: সেরে গেছে ? হঠাৎ ?

কেশব হেসে বলে, তা সারে নি, তবে সেরে গেছেই বলা যায়। আমার অসুখ কেন জানিস ? সংসারটা বদখত হয়ে আছে বলে। সংসারটা পাল্টে দেবার লড়াই করব ঠিক করছি।

কানু বলে, বটে ! তা ও লড়াই তো কত লোকেই করছে। সংসারটা যদ্দিন না পাল্টাচ্ছে তদ্দিন তোর রোগ সারবে না ?

কেশব বলে, শোন না, সেই কথাই বলছি। সবার জীবন শুধরে দেবার লড়াই করবো ঠিক করতে রোগ যেন অর্দ্ধেক কমে গেছে। লড়াই আরম্ভ করলে নিশ্চয় আরোগ্য।

